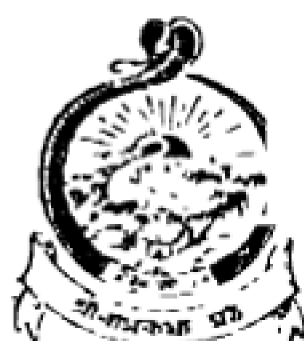
ভক্তিযোগ

স্বামী বিবেকানন্দ



অষ্টাদশ সংস্করণ

এক টাকা চার আনা

প্রকাশক—
স্বামী আত্মবোধানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়
১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার
কলিকাতা—৩

মুদ্রাকর—
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শীল,
শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
২৭বি, গ্রে ষ্ট্রীট কলিকাতা

অনুবাদকের নিবেদন

চতুর্থ সংস্করণে মূলগ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণের সহিত মিলাইয়া অনুবাদক কর্ত্তৃক অনুবাদ আদ্যোপান্ত যথাসাধ্য সংশোধিত হইয়াছে। বিশেষতঃ ইহার অন্তর্গত সংস্কৃতাংশগুলি ও উহাদের অনুবাদ মূল সংস্কৃতগ্রন্থসমূহের সহিত উত্তমরূপে মিলাইয়া দেওয়াতে পূর্ব্বে অনিবার্য্যরূপে যে-সকল ভ্রম-প্রমাদ রহিয়া গিয়াছিল, তাহা বোধ হয় এবার আর থাকিবে না। ভাষাও অপেক্ষাকৃত উত্তম করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে এবং কয়েকটি নূতন পাদটীকাও সংযোজিত হইয়াছে। এই সকল কারণে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণের সহিত ইহার কিছু কিছু পার্থক্য লক্ষিত হইবে। এক্ষণে এই সংস্করণের দ্বারা স্বামিজীর যথার্থ ভাব পাঠকবর্গের বুঝিবার অধিকতর সাহায্য হইয়া থাকিলেই অনুবাদক আপনাকে সফলপরিশ্রম জ্ঞান করিবেন।

১লা বৈশাখ, ১৩৪২

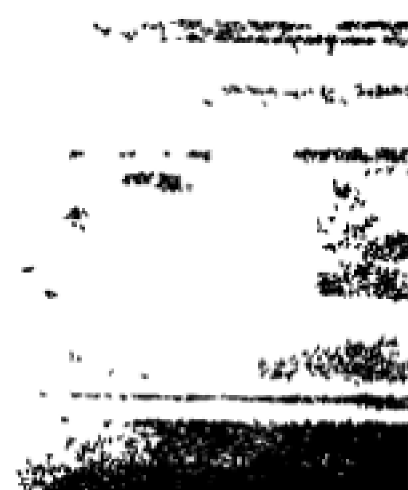
সূচীপত্র

"স তন্ময়ো হ্যমৃত ঈশসংস্থো
জ্ঞঃ সর্ব্বগো ভুবনস্যাস্য গোপ্তা।
য ঈশেহস্য জগতো নিত্যমেব
নান্যো হেতুর্বিদ্যত ঈশনায়॥
যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।
তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং
মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে॥"

তিনি জগন্ময়, অমর, নিয়ন্তৃরূপে অবস্থিত, জ্ঞাতা, সর্ব্বব্যাপী, এই জগতের পালয়িতা। তিনি অনন্তকাল জগৎ শাসন করিতেছেন, এই জগৎশাসনের অন্য হেতু কেহ নাই।

যিনি আদিতে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন ও পরে তাঁহাকে বেদ প্রদান করিয়াছিলেন, মোক্ষলাভেচ্ছায় আমি সেই দেবের শরণ লইলাম, যাঁহার প্রকাশে বুদ্ধিকে আত্মাভিমুখী করিয়া দেয়।

—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ১৭ ও ১৮ শ্লোক



ভক্তিযোগ

ভক্তির লক্ষণ

অকপটভাবে ঈশ্বরানুসন্ধানই ভক্তিযোগ; প্রীতি ইহার আদি, মধ্য ও সমাপ্তি। মুহূর্ত্তস্থায়ী ভগবৎ-প্রেমোন্মত্ততাও শাশ্বতী মুক্তির প্রসূতি। নারদ তদীয় 'ভক্তিসূত্রে' বলিয়াছেন, "ভগবানে পরম প্রেমই ভক্তি।" "জীব এতল্লাভে সর্ব্বভূতে প্রেমবান্ ও ঘৃণাশূন্য হয় এবং অনন্তকালের জন্য তুষ্টি লাভ করে।" "এই প্রেমের দ্বারা কোন কাম্য বস্তু লাভ হইতে পারে না, কারণ বিষয়বাসনা থাকিতে এই প্রেমের উদয়ই হয় না।" "ভক্তি—কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ হইতেও শ্রেষ্ঠতরা।" কারণ সাধ্যবিশেষই উহাদের লক্ষ্য, কিন্তু "ভক্তি স্বয়ংই সাধ্য ও সাধনস্বরূপা।" *

অস্মদ্দেশীয় সকল মহাপুরুষই ভক্তিতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। শাণ্ডিল্য, নারদাদি ভক্তিতত্ত্বের বিশেষ ব্যাখ্যাতাগণকে ছাড়িয়া,

* ওঁ সা কস্মৈ পরমপ্রেমরূপা।

—নারদ-সূত্র, ১ম অনুবাক, ২য় সূত্র

ওঁ সা ন কাময়মানা নিরোধরূপত্বাৎ।

—ঐ, ২য় অনুবাক, ৭ম সূত্র

ওঁ সা তু কর্ম্মজ্ঞানযোগেভ্যোঽপ্যধিকতরা। —ঐ, ৪র্থ অঃ, ২৫শ সূত্র

ওঁ স্বয়ং ফলরূপতেতি ব্রহ্মকুমারাঃ। —ঐ, ঐ, ৩০শ সূত্র।

দিলেও, স্পষ্টতঃ জ্ঞানমার্গসমর্থনকারী ব্যাসসূত্রভাষ্যকার মহাপণ্ডিতগণও ভক্তিসম্বন্ধে অনেক ইঙ্গিত করিয়াছেন। সমুদয় না হউক, অধিকাংশ সূত্রগুলিই শুষ্ক জ্ঞানসূচক অর্থে ব্যাখ্যা করিবার আগ্রহ ভাষ্যকারগণের থাকিলেও সূত্রগুলির বিশেষতঃ, উপাসনা-কাণ্ডের সূত্রগুলির অর্থ নিরপেক্ষভাবে অনুসন্ধান করিলে সহজে তাহাদের ঐরূপ যথেচ্ছ ব্যাখ্যা চলিতে পারে না।

সাধারণতঃ লোকের সংস্কার—জ্ঞান ও ভক্তি অতিশয় পৃথক্ বস্তু; বাস্তবিক তাহা নহে। পরে বুঝিব, জ্ঞান ও ভক্তি শেষে কেমন একই লক্ষ্যস্থলে লইয়া যায়। রাজযোগের লক্ষ্যও তাহাই। অনবহিত ব্যক্তিগণের চক্ষে ধূলিপ্রক্ষেপের উদ্দেশ্যে না হইয়া (জুয়াচোর ও গুপ্তবিদ্যার নামে ছলনাকারীদের হস্তে পড়িলে উহা ঐরূপই দাঁড়ায়) মুক্তিলাভোদ্দেশে অনুষ্ঠিত হইলে, উহাও সেই একই লক্ষ্যে পঁহুছিয়া দেয়।

ভক্তিযোগে এক বিশেষ সুবিধা—উহা আমাদের চরম লক্ষ্য ঈশ্বরে পঁহুছিবার অতি সহজ ও স্বাভাবিক পন্থা। কিন্তু উহাতে বিশেষ বিপদাশঙ্কা এই যে, নিম্নস্তরের ভক্তি অনেক সময়ে ভয়ানক গোঁড়ামির আকার ধারণ করে। হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টধর্মান্তর্ব্বর্ত্তী গোঁড়ার দল এই নিম্নস্তরের ভক্তিসাধকগণের ভিতরই প্রায় অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়। যে ইষ্ট-নিষ্ঠা ব্যতীত প্রকৃত প্রেমের উৎপত্তিই অসম্ভব, অনেক সময় তাহা আবার অন্য সমুদয় মতের উপর তীব্র আক্রমণ ও দোষারোপেরও কারণ। সকল ধর্ম্মের ও সকল দেশের দুর্ব্বলাধিকারী অবিকশিতমস্তিষ্ক পুরুষগণেরই তাহাদের আদর্শ-সত্যকে ভালবাসিবার একমাত্র উপায়

আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। সেই উপায় এই—অপর সমুদয় আদর্শে ঘৃণাপোষণ করা। নিজ ঈশ্বরাদর্শে, নিজ ধর্ম্মাদর্শে একান্ত অনুরক্ত ব্যক্তিগণ অন্য কোনও আদর্শের বিষয় শুনিলে কেন নানাবিধ গোঁড়ামি করিয়া চীৎকার করিতে থাকে, তাহার কারণ ইহা হইতেই বুঝা যায়। এরূপ প্রেম যেন প্রভুর বিষয়ে অপরের হস্তক্ষেপ-নিবারণের কুকুরসুলভ সহজ প্রবৃত্তিস্বরূপ। তবে প্রভেদ এই, কুকুরের এই সহজ প্রবৃত্তি মানবযুক্তি হইতে শ্রেষ্ঠতর—প্রভু যে বেশধারী হইয়াই তাহার সম্মুখে আসুন না কেন, কুকুর তাঁহাকে কখনও শত্রু বলিয়া ভ্রমে পড়ে না। গোঁড়া আবার সমুদয় বিচার-শক্তি হারাইয়া ফেলে। ব্যক্তিগত বিষয়ে তাহার এত অধিক দৃষ্টি যে, কোন্ ব্যক্তি কি বলে, তাহা সত্য কি মিথ্যা, তাহার মতে তাহা দেখিবার কিছু প্রয়োজন নাই, কিন্তু কে উহা বলিতেছে সেই বিষয়েই তাহার বিশেষ দৃষ্টি। যে লোক নিজ সম্প্রদায়ের—নিজের সহিত একমত ব্যক্তিগণের উপর দয়াশীল, ন্যায়পর ও প্রেমযুক্ত, সেই দেখিবে নিজ সম্প্রদায়ের বহির্ভূত লোকগুলির প্রতি না করিতে পারে এমন কার্য্যই নাই।

তবে এ আশঙ্কা কেবল ভক্তির নিম্নস্তরেই আছে—এই অবস্থার নাম গৌণী উহা একটু পরিপক্ক হইয়া পরাভক্তিরূপে পরিণত হইলে আর এরূপ ভয়ানক গোঁড়ামি আসিবার আশঙ্কা থাকে না। এই পরাভক্তিতে অভিভূত ব্যক্তি প্রেমস্বরূপ ভগবানের এত নিকট পঁহুছিয়াছেন যে, তিনি আর অপরের প্রতি ঘৃণা-ভাব বিস্তারের যন্ত্রস্বরূপ হইতে পারেন না।

এই জীবনেই সকলে যে সামঞ্জস্যের সহিত চরিত্র গঠন করিবে

তাহা সম্ভব নহে, তবে আমরা জানি যে চরিত্রে জ্ঞান, ভক্তি ও যোগ সমভাবে বিরাজমান, সেই চরিত্রই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চদরের। পাখীর উড়িতে তিনটি জিনিসের আবশ্যক—দুইটি পক্ষ ও চালাইবার হালস্বরূপ একটি পুচ্ছ। জ্ঞান ও ভক্তি দুইটি পক্ষ, যোগ উহাদের সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য পুচ্ছস্বরূপ। যাহারা এই তিনরূপ সাধন-প্রণালী এক সঙ্গে সামঞ্জস্যের সহিত অনুষ্ঠান করিতে না পারিয়া ভক্তিই একমাত্র পথস্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহাদের পক্ষে এটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, বাহ্য অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপ প্রথম অবস্থায় সাধকের পক্ষে অত্যাবশ্যক হইলেও ভগবানের প্রতি প্রগাঢ় প্রেম জন্মাইয়া দেওয়া ব্যতীত তাহাদের অন্য কোনরূপ উপযোগিতা নাই।

জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গের উপদেষ্টাগণের ভিতর একটু সামান্য মতভেদ আছে, যদিও উভয়েই ভক্তির প্রভাবে বিশ্বাসী। জ্ঞানীরা ভক্তিকে মুক্তির উপায়মাত্র বলিয়া বিশ্বাস করেন, কিন্তু ভক্তেরা উহাকে উপায় ও উদ্দেশ্য উভয়ই বলিয়া থাকেন। আমার বোধ হয়, এ প্রভেদ কেবল নামমাত্র। প্রকৃতপক্ষে, ভক্তিকে সাধন-স্বরূপ ধরিলে নিম্নস্তরের উপাসনামাত্র বুঝায়। আর এই নিম্ন-স্তরের উপাসনাই একটু অগ্রসর হইলে উচ্চস্তরের ভক্তির সহিত অভেদভাব ধারণ করে। সকলেই বোধ হয় যেন নিজ নিজ সাধনপ্রণালীর উপর ঝোঁক দিয়া থাকেন। পূর্ণ ভক্তির উপরে প্রকৃত জ্ঞান অযাচিত হইলেও আসিবেই আসিবে, আর পূর্ণ জ্ঞানের সহিত প্রকৃত ভক্তিও অভেদ—এ সত্য তাঁহারা যেন ভুলিয়া না যান।

এইটি মনে রাখিয়া এ বিষয়ে পূজনীয় বেদান্তভাষ্যকারেরা কি বলেন দেখা যাউক। 'আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ'—এই সূত্র ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ভগবান্ শঙ্কর বলেন, "লোকে এইরূপ বলিয়া থাকে—অমুক গুরুর ভক্ত, অমুক রাজার ভক্ত। যে গুরুর বা রাজার নির্দ্দেশানুবর্ত্তী হয় এবং সেই নির্দ্দেশানুবর্ত্তনকেই একমাত্র লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করে তাহাকেই ঐরূপ বলিয়া থাকে। আরও এইরূপ লোকে বলিয়া থাকে—'পতিপ্রাণা স্ত্রী বিদেশগত পতির ধ্যান করিতেছে।' এখানেও একরূপ সাগ্রহ অবিচ্ছিন্ন স্মৃতিই লক্ষিত হইয়াছে।" শঙ্করের মতে ইহাই ভক্তি।*

আবার ভগবান্ রামানুজ 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' সূত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,

"এক পাত্র হইতে অপর পাত্রে নিক্ষিপ্ত অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় প্রবাহিত ধ্যেয় বস্তুর নিরন্তর স্মরণের নাম ধ্যান। 'যখন এইরূপ ভগবৎ-স্মৃতির অবস্থা লব্ধ হয়, তখন সকল বন্ধননাশ হয়।' এইরূপে শাস্ত্র এই নিরন্তর স্মরণকে মুক্তির কারণ বলিয়াছেন। এই স্মৃতি আবার দর্শনের সহিত অভেদ। কারণ, 'সেই পর ও অবর (দূর ও সন্নিহিত) পুরুষকে দেখিলে হৃদয়-গ্রন্থি নাশ হয়, সমুদয় সংশয় ছিন্ন হইয়া যায় এবং কর্ম্মক্ষয় হইয়া

* তথা হি লোকে গুরুমুপাস্তে রাজানমুপাস্ত ইতি চ যস্তাৎপর্য্যেণ গুর্ব্বাদীননুবর্ত্ততে স এবমুচ্যতে। তথা ধ্যায়তি প্রোষিতনাথা পতিমিতি যা নিরন্তরস্মরণা পতিং প্রতি সোৎকণ্ঠা সৈবমভিধীয়তে।

—ব্রহ্মসূত্র, ৪র্থ অধ্যায়, ১ম পাদ, ১ম সূত্র শাঙ্করভাষ্য

যায়।' এই শাস্ত্রোক্ত বাক্যে 'স্মৃতি' দর্শনের সহিত সমানার্থকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। যিনি সন্নিহিত তাঁহাকে দেখা যাইতে পারে, কিন্তু যিনি দূরবর্ত্তী তাঁহাকে কেবল স্মরণমাত্র করা যাইতে পারে, তথাপি শাস্ত্র আমাদিগকে সন্নিহিত ও দূরস্থ উভয়কেই দেখিতে বলিতেছেন, সুতরাং ঐরূপ স্মরণ ও দর্শন সমকার্য্যকর সূচিত হইল। এই স্মৃতি প্রগাঢ় হইলে দর্শনের তুল্য হইয়া পড়ে। ... আর উপাসনা-অর্থে সর্ব্বদা স্মরণ, ইহা শাস্ত্রের প্রধান প্রধান শ্লোক হইতে দৃষ্ট হয়। জ্ঞান—যাহা নিরন্তর উপাসনার সহিত অভেদ, তাহাও নিরন্তর স্মরণ-অর্থে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ... সুতরাং স্মৃতি যখন প্রত্যক্ষানুভূতির আকার ধারণ করে, তাহাই শাস্ত্রে মুক্তির কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। 'নানাবিধ বিদ্যা দ্বারা, বুদ্ধির দ্বারা, কিংবা বহুবার বেদাধ্যয়নের দ্বারা আত্মা লভ্য নহেন। যাঁহাকে এই আত্মা বরণ করেন, তিনিই সেই আত্মাকে লাভ করেন। তাঁহার নিকটে আত্মা আপন স্বরূপ প্রকাশ করেন।' এস্থলে প্রথমে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মা লব্ধ হন না বলিয়া পরে বলিতেছেন, 'আত্মা যাঁহাকে বরণ করেন, তাঁহার দ্বারাই আত্মা লব্ধ হন'; অত্যন্ত প্রিয়কেই 'বরণ' করা সম্ভব। যিনি আত্মাকে অতিশয় ভালবাসেন, আত্মা তাঁহাকেই অতিশয় ভালবাসেন। এই প্রিয় ব্যক্তি যাহাতে আত্মাকে লাভ করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে ভগবান্ স্বয়ং তাঁহাকে সাহায্য করেন। কারণ, ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন, 'যাহারা আমাতে নিরন্তর আসক্ত এবং আমাকে প্রেমের সহিত উপাসনা করে, আমি তাহাদিগের বুদ্ধি এমনভাবে চালিত করি,

যাহাতে তাহারা আমাকে লাভ করে।'* অতএব কথিত হইয়াছে যে, প্রত্যক্ষ অনুভাবাত্মক এই স্মৃতি যাঁহার অতি প্রিয় (উহা ঐ স্মৃতির বিষয়ীভূত পুরুষের অতি প্রিয় বলিয়া) তাঁহাকেই সেই পরমাত্মা বরণ করেন, তাঁহার দ্বারাই সেই পরমাত্মা লব্ধ হন। এই নিরন্তর স্মরণ 'ভক্তি' শব্দের দ্বারা লক্ষিত হইয়াছে।

---

* ধ্যানং তৈলধারাবদবিচ্ছিন্নস্মৃতিসংতানরূপা ধ্রুবা স্মৃতিঃ। 'স্মৃত্যুপলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ' ইতি ধ্রুবায়াঃ স্মৃতেরপবর্গোপায়ত্বশ্রবণাৎ। সা চ স্মৃতির্দ্দর্শনসমানাকারা; 'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে' ইত্যনেনৈকার্থ্যাৎ এবং চ সতি 'আত্মা বারে দ্রষ্টব্যঃ' ইত্যনেন নিদিধ্যাসনস্য দর্শনরূপতা বিধীয়তে। ভবতি চ স্মৃতের্ভাবনপ্রকর্ষাদ্দর্শনরূপতা। বাক্যকারেণৈতৎ সর্ব্বং প্রপঞ্চিতম্। 'বেদনমুপাসনম্ স্যাৎ তদ্বিষয়ে শ্রবণাদিতি।' সর্ব্বাস্বুপনিষৎসু মোক্ষসাধনতয়া বিহিতং 'বেদনমুপাসনম্' ইত্যুক্তং 'সকৃৎপ্রত্যয়ং কুর্য্যাচ্ছব্দার্থস্য কৃতত্বাৎ প্রযাজাদিবৎ' ইতি পূর্ব্বপক্ষং কৃত্বা 'সিদ্ধং তুপাসনশব্দাৎ' ইতি বেদনমসকৃদাবৃত্তং মোক্ষসাধনমিতি নির্ণীতম্। 'উপাসনং স্যাদ্ ধ্রুবানুস্মৃতির্দ্দর্শনান্নির্ব্বচনাচ্চেতি' তস্যৈব বেদনস্যোপাসনরূপস্যাসকৃদাবৃত্তস্য ধ্রুবানুস্মৃতিত্বমুপবর্ণিতম্। সেয়ং স্মৃতির্দ্দর্শনরূপা প্রতিপাদিতা, দর্শনরূপতা চ প্রত্যক্ষতাপত্তিঃ। এবং প্রত্যক্ষতাপন্নামপবর্গসাধনভূতাং স্মৃতিং বিশিনষ্টি—'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া, ন বহুনা শ্রুতেন যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্' ইতি অনেন কেবলশ্রবণমনননিদিধ্যাসনানামাত্মপ্রাপ্ত্যনুপায়তামুক্ত্বা 'যমেবৈষ আত্মা বৃণুতে তেনৈব লভ্যঃ' ইত্যুক্তম্। প্রিয়তম এব হি বরণীয় ভবতি, যস্যায়ং নিরতিশয়প্রিয়ঃ স এবাস্য প্রিয়তমো ভবতি। যথায়ং প্রিয়তম আত্মানং প্রাপ্নোতি, তথা স্বয়মেব ভগবান্ প্রযতত ইতি ভগবতৈবোক্তং—'তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন

পতঞ্জলির 'ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা' সূত্রটির ব্যাখ্যায় ভোজ বলেন —"প্রণিধান অর্থে সেইরূপ ভক্তি, যাহাতে সমুদয় ফলাকাঙ্ক্ষা (যেমন ইন্দ্রিয়ের ভোগাদি) ত্যক্ত হইয়া সমুদয় কর্ম্ম সেই গুরুর উপর সমর্পিত হয়।" * আবার ভগবান্ ব্যাস উহার ব্যাখ্যায় বলেন, "প্রণিধান অর্থে ভক্তিবিশেষ, যদ্দ্বারা যোগীর নিকট সেই পরম পুরুষের কৃপার আবির্ভাব হয় এবং তাঁহার বাসনা-সকল পূরণ করে।" † শাণ্ডিল্যের মতে "ঈশ্বরে পরমানুরক্তিই ভক্তি।" ‡ ভক্তরাজ প্রহ্লাদ কিন্তু ভক্তির যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা সমীচীন বোধ হয়। "অজ্ঞলোকদের ইন্দ্রিয়-বিষয়ে যেরূপ মহান্ আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়, তোমায় স্মরণ করিবার সময় তোমার প্রতি সেইরূপ তীব্র আসক্তি যেন আমার

মামুপযান্তি তে' ইতি 'প্রিয়োহি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ' ইতি চ। অতঃ সাক্ষাৎকাররূপা স্মৃতিঃ, স্মর্য্যমাণাত্যর্থপ্রিয়ত্বেন স্বয়মপ্যত্যর্থপ্রিয়া যস্য স এব পরমাত্মনা বরণীয়ো ভবতীতি তেনৈব লভ্যতে পরমাত্মেত্যুক্তং ভবতি, এবংরূপা ধ্রুবানুস্মৃতিরেব ভক্তিশব্দেনাভিধীয়তে।

—ব্রহ্মসূত্র, প্রথমসূত্রের রামানুজভাষ্য

* প্রণিধানং তত্র ভক্তিবিশেষো বিশিষ্টমুপাসনং সর্ব্বক্রিয়াণামপি তত্রার্পণং। বিষয়সুখাদিকং ফলমনিচ্ছন্ সর্ব্বাঃ ক্রিয়াস্তস্মিন্ পরমগুরাবর্পয়তি।

—পাতঞ্জল দর্শন, ১ম অধ্যায়, সমাধিপাদ, ২৩শ সূত্রের ভোজবৃত্তি

† 'প্রণিধানাদ্ভক্তিবিশেষাদাবর্জ্জিত ঈশ্বরস্তমনুগৃহ্ণাত্যভিধ্যানমাত্রেণ' ইত্যাদি।

—পাতঞ্জল দর্শন, প্রথম অধ্যায়, সমাধিপাদ, ২৩শ সূত্র ব্যাসভাষ্য।

‡ 'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে' —শাণ্ডিল্যসূত্র, ১ম অঃ, ২য় সূত্র

হৃদয় হইতে অপসারিত না হয়।" * আসক্তি—কাহার জন্ম? পরম প্রভু ঈশ্বরের জন্ম। আর কোন পুরুষের (তিনি যত বড়ই হউন না কেন) প্রতি আসক্তি কখনই 'ভক্তি' হইতে পারে না। ইহার প্রমাণস্বরূপ রামানুজ শ্রীভাষ্যে এক প্রাচীন আচার্য্যের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—"ব্রহ্মা হইতে ক্ষুদ্র তৃণ পর্য্যন্ত জগদন্তর্গত সকল প্রাণী কর্ম্মহেতু জন্ম ও মৃত্যুর বশীভূত; তাহারা অজ্ঞানসীমান্তর্ব্বর্ত্তী ও পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া সাধকের ধ্যানের সহায় নহে।" † শাণ্ডিল্যসূত্রস্থ 'অনুরক্তি' শব্দ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ব্যাখ্যাকার স্বপ্নেশ্বর বলেন, উহার অর্থ: অনু—পশ্চাৎ, ও রক্তি—আসক্তি অর্থাৎ "ভগবানের স্বরূপ ও মহিমা-জ্ঞানের পর তাঁহার প্রতি যে আসক্তি আসে।" ‡ তাহা না হইলে যে কোন ব্যক্তির প্রতি, যেমন স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি অন্ধ আসক্তিও ভক্তি হইয়া যায়। অতএব আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি সাধারণ পুজাপাঠাদি হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশ্বরে প্রগাঢ় অনুরাগান্ত আধ্যাত্মিক অনুভূতির জন্ম চেষ্টাপরম্পরার নাম ভক্তি।

* যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েম্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥
—বিষ্ণুপুরাণ, ১ম অংশ, ২০ অধ্যায়, ১৯ শ্লোক

† আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্তা জগদন্তর্ব্যবস্থিতাঃ।
প্রাণিনঃ কর্ম্মজনিতসংসারবশবর্ত্তিনঃ॥
যতস্ততো ন তে ধ্যানে ধ্যানিনামুপকারকাঃ।
অবিদ্যান্তর্গতাঃ সর্ব্বে তে হি সংসারগোচরাঃ॥

‡ ভগবন্মহিমাদিজ্ঞানাদনু— পশ্চাজ্জায়মানত্বাদনুরক্তিরিত্যুক্তম্।
—শাণ্ডিল্যসূত্র, ১ম আহ্নিক, ২য় সূত্র, স্বপ্নেশ্বরটীকা

ঈশ্বরের স্বরূপ

ঈশ্বর কে? "যাহা দ্বারা জন্ম, স্থিতি ও লয় হইতেছে"* তিনি ঈশ্বর—"অনন্ত, শুদ্ধ, নিত্যমুক্ত, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ, পরমকারুণিক, গুরুর গুরু।" † আরও সকলের উপর "তিনি অনির্ব্বচনীয় প্রেমস্বরূপ।" ‡

এইগুলি অবশ্য সগুণ ঈশ্বরের সংজ্ঞা। তবে কি ঈশ্বর দুইটি? জ্ঞানী 'নেতি নেতি' করিয়া যে সচ্চিদানন্দে উপনীত হন তিনি একটি এবং ভক্তের প্রেমময় ভগবান্ আর একটি? না সেই একই সচ্চিদানন্দ—প্রেমময় ভগবান্‌ও বটেন, তিনি সগুণ নির্গুণ উভয়ই? সর্ব্বদাই মনে রাখা আবশ্যক ভক্তের উপাস্য সগুণ ঈশ্বর, ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বা পৃথক্ নহেন। সবই সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্ম। তবে ব্রহ্মের এই নির্গুণ স্বরূপ অতি সূক্ষ্ম বলিয়া প্রেম বা উপাসনার যোগ্য নহে। এই কারণে ভক্ত ব্রহ্মের সগুণ ভাব অর্থাৎ পরম-নিয়ন্তা ঈশ্বরকেই উপাস্যরূপে স্থির করেন। একটি উপমার দ্বারা বুঝা যাউক—

ব্রহ্ম যেন মৃত্তিকা বা উপাদান—তাহা হইতে অনেক বস্তু নির্ম্মিত হইয়াছে। মৃত্তিকারূপে তাহারা এক বটে; কিন্তু রূপ বা প্রকাশ উহাদিগকে পৃথক্ করিয়াছে। উৎপত্তির পূর্ব্বে তাহারা

---

* জন্মাদ্যস্য যতঃ।

—ব্রহ্মসূত্র, ১ম অধ্যায়, ১ম পাদ, ২য় সূত্র

† পাতঞ্জল, সমাধি পাঃ, ২৫, ২৬।

‡ স ঈশ্বরোঽনির্বচনীয়প্রেমস্বরূপঃ। —শাণ্ডিল্যসূত্র

ঐ মৃত্তিকাতেই গূঢ় ভাবে ছিল। উপাদান হিসাবে তাহারা এক কিন্তু যখন উহারা বিশেষ বিশেষ রূপ ধারণ করে, আর যতদিন সেই রূপ থাকে ততদিন তাহারা পৃথক্ পৃথক্। মাটির ইঁদুর কখনও মাটির হাতী হইতে পারে না। কারণ, গঠিতাবস্থায় বিশেষ আকৃতিই তাহাদের বিশেষত্বের জ্ঞাপক। বিশেষ আকৃতিহীন মৃত্তিকা হিসাবে অবশ্য উহারা একই। ঈশ্বর সেই পূর্ণ সত্যস্বরূপের উচ্চতম অভিব্যক্তি অথবা মনুষ্যমনের সর্ব্বোচ্চ উপলব্ধি। সৃষ্টি অনাদি, ঈশ্বরও অনাদি।

বেদান্তসূত্রের চতুর্থাধ্যায়ের চতুর্থ পাদে মুক্তিলাভের পর মুক্তাত্মার যে এরূপ অনন্ত শক্তি ও জ্ঞান আসে, তাহা বর্ণন করিয়া ব্যাস আর এক সূত্রে বলিতেছেন, "কিন্তু কেহই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের শক্তিলাভ করিবেন না, তাহা কেবল ঈশ্বরের।"* এই সূত্রব্যাখ্যার সময় দ্বৈতবাদী ভাষ্যকারগণ পরতন্ত্র জীবের পক্ষে ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি ও পূর্ণ স্বতন্ত্রতা লাভ করা যে কোন কালে সম্ভব নহে, তাহা অনায়াসে দেখাইতে পারেন। ঘোর দ্বৈতবাদী ভাষ্যকার মধ্বাচার্য্য বরাহপুরাণ হইতে একটি শ্লোক তুলিয়া তাঁহার প্রিয় সংক্ষিপ্ত উপায়ে এই সূত্রটির ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এই সূত্র ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ভাষ্যকার রামানুজ বলেন, "সংশয় উপস্থিত হয় যে, মুক্তাত্মাদিগের শক্তির মধ্যে পরম পুরুষের অসাধারণ শক্তি অর্থাৎ জগৎসৃষ্টি আদি ও সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব অন্তর্ভুক্ত? অথবা তদ্রহিত পরম পুরুষের সাক্ষাৎ দর্শনই কেবল তাঁহাদের

* জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাচ্চ।

—ব্রহ্মসূত্র, ৪র্থ অধ্যায়, ৪র্থ পাদ, ১৭শ সূত্র

ঐশ্বর্য্য? এই সংশয় উপস্থিত হইলে পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত হয় যে, মুক্তাত্মা জগতের নিয়ন্তৃত্ব লাভ করেন, ইহা যুক্তিযুক্ত; কারণ, শুদ্ধরূপ হইয়া তিনি পরম একত্ব লাভ করেন (মুণ্ডক উপনিষদ্, ৩।১।৩)। এই শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা ইহা কথিত হইয়াছে যে, তিনি পরম পুরুষের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হন। অন্য স্থলে ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, তাঁহার সমুদয় বাসনা পূর্ণ হয়। এক্ষণে কথা এই, পরম একত্ব ও সমুদয় বাসনার পরিপূরণ পরম পুরুষের অসাধারণ শক্তি জগন্নিয়ন্তৃত্ব ব্যতীত হইতে পারে না। অতএব সমুদয় বাসনার পরিপূরণ ও পরম একতা লাভ হয় বলিলেই মানিতে হইবে, মুক্তাত্মা সমুদয় জগতের নিয়ন্তৃত্ব লাভ করেন। ইহার উত্তরে বলি, মুক্তাত্মা কেবল জগন্নিয়ন্তৃত্ব ব্যতীত আর সমুদয় শক্তি লাভ করেন। জগন্নিয়মন অর্থে—জগতের সমুদয় স্থাবর জঙ্গমের বিভিন্ন প্রকার স্বরূপ, স্থিতি ও বাসনার নিয়ন্তৃত্ব। মুক্তাত্মাদিগের কিন্তু এই জগন্নিয়মন-শক্তি নাই, তাঁহাদের অবশ্য পরমাত্মদৃষ্টির আবরণ চলিয়া গিয়াছে এবং তাঁহাদের প্রত্যক্ষ ব্রহ্মানুভূতি হয়—ইহাই তাঁহাদের একমাত্র ঐশ্বর্য্য। ইহা কিরূপে জানিলে? শাস্ত্রবাক্যবলে ইহা জানিয়াছি। নিখিল জগন্নিয়ন্তৃত্ব কেবল পরব্রহ্মেরই গুণ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। যথা—'যাঁহা হইতে সমুদয় বস্তু জন্মায়, যাঁহাতে অবস্থিতি করে এবং যাঁহাতে প্রলয়কালে সমুদয় প্রবেশ করে, তাঁহার সম্বন্ধে জানিবার ইচ্ছা কর, তিনি ব্রহ্ম।' যদি এই জগন্নিয়ন্তৃত্ব মুক্তাত্মাদেরও সাধারণ গুণ হয়, তবে উদ্ধৃত শ্লোক ব্রহ্মের লক্ষণ হইতে পারে না, কারণ তাঁহার নিয়ন্তৃত্ব-গুণের দ্বারা তাঁহার লক্ষণ করা হইয়াছে। অসাধারণেরই বিশেষ লক্ষণের

আবশ্যক হয়। অতএব, নিম্নোদ্ধৃত শাস্ত্রবাক্যসমূহে পরমপুরুষকেই জগন্নিয়মনের কর্ত্তারূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, আর ঐ ঐ স্থলে মুক্তাত্মার এমন বর্ণনা নাই, যাহাতে জগন্নিয়ন্তৃত্ব তাঁহাদের উপর আরোপিত হইতে পারে। শাস্ত্রবাক্যগুলি এই—"বৎস, আদিতে একমেবাদ্বিতীয়ম্ ছিলেন। তিনি আলোচনা করিলেন, আমি বহু সৃষ্টি করিব। তিনি তেজ সৃজন করিলেন।" "কেবল ব্রহ্মাই আদিতে ছিলেন। তিনি পরিণত হইলেন। তিনি ক্ষত্র নামে এক সুন্দর রূপ সৃজন করিলেন। সকল দেবতাই যথা—বরুণ, সোম, রুদ্র, পর্জ্জন্য, যম, মৃত্যু, ঈশান—ইহারা ক্ষত্র। আদিতে আত্মাই ছিলেন। ক্রিয়াশীল আর কিছুই ছিল না। তিনি আলোচনা করিলেন, আমি জগৎ সৃষ্টি করিব—পরে তিনি এই জগৎ সৃজন করিলেন।" "একমাত্র নারায়ণই ছিলেন। ব্রহ্মা, ঈশান, দ্যাবাপৃথিবী, তারা, জল, অগ্নি, সোম কিংবা সূর্য্য কিছুই ছিল না, তিনি একাকী সুখী হইলেন না। ধ্যানের পর তাঁহার একটি কন্যা ও দশ-ইন্দ্রিয় জন্মিল।" "যিনি পৃথিবীতে নিবাস করিয়া পৃথিবী হইতে স্বতন্ত্র", "যিনি আত্মাতে বাস করিয়া" ইত্যাদি।* পরসূত্র-ব্যাখ্যায় রামানুজ বলিতেছেন, "যদি বল ইহা

* কিং মুক্তৈশ্বর্য্যং জগৎসৃষ্ট্যাদি পরমপুরুষসাধারণং সর্ব্বেশ্বরত্বমপি উত তদ্রহিতং কেবলপরমপুরুষানুভববিষয়মিতিসংশয়ঃ, কিং যুক্তং, জগদীশ্বরত্বমপীতি, কুতঃ, নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতীতি পরমপুরুষেণ পরমসাম্যাপত্তিশ্রুতেঃ, সত্যসঙ্কল্পত্বশ্রুতেশ্চ, নহি পরমসাম্যসত্যসঙ্কল্পত্বং সর্ব্বেশ্বরাসাধারণ-জগদ্ব্যাপাররূপ জগন্নিয়মনেন বিনোপপদ্যতে অতঃ সত্যসঙ্কল্পতাপরমসাম্যোপপত্তয়ে সমস্তজগন্নিয়মনরূপমপি মুক্তৈশ্বর্য্যমিত্যেবং প্রাপ্তে, প্রচক্ষহে, জগদ্ব্যাপারবর্জ্জমিতি, জগদ্ব্যাপারো

সত্য নহে, কারণ বেদে ইহার বিপরীতার্থপ্রতিপাদক অনেক শ্লোক আছে, তাহা হইলে বলিব তাহা নিম্নদেবলোকে মুক্তাত্মার ঐশ্বর্য্যবর্ণনামাত্র।* ইহাও একরূপ সহজ মীমাংসা হইল। যদিও রামানুজের মতে সমষ্টির একতা স্বীকৃত হইয়াছে, তথাপি তাঁহার মতে এই সমষ্টির মধ্যে নিত্য ভেদসমূহ আছে। অতএব এ মতও কার্য্যতঃ দ্বৈত বলিয়া জীবাত্মা ও সগুণ ঈশ্বরের ভেদ রক্ষা করা রামানুজের মতে কঠিন কার্য্য হয় নাই।

নিখিলচেতনাচেতনস্বরূপস্থিতিপ্রবৃত্তিভেদনিয়মনস্তবর্জ্জং নিরস্তনিখিলতিরোধানস্য নির্ব্যাজব্রহ্মানুভবরূপং মুক্তস্যৈশ্বর্য্যং, কুতঃ প্রকরণাৎ নিখিলজগন্নিয়মনং হি পরং ব্রহ্ম প্রকৃত্যাম্নায়তে, 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্মেতি'। যদ্যেতন্নিখিলজগন্নিয়মনং মুক্তানামপি সাধারণং স্যাৎ, ততশ্চেদং জগদীশ্বরত্বরূপং ব্রহ্মলক্ষণং ন সঙ্গচ্ছতে। অসাধারণস্য হি লক্ষণত্বং তথা 'সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তত্তেজোহসৃজতেতি' 'ব্রহ্ম বা ইদমেকমেবাগ্র আসীত্তদেকং সন্নবাভবৎ, তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ক্ষত্রংযান্যেতানি দেবক্ষত্রাণীন্দ্রো বরুণঃ সোমো রুদ্রঃ পর্জ্জন্যো যমো মৃত্যুরীশান' ইতি 'আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ স ঐক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি স ইমাল্লোঁকানসৃজত' ইতি। 'একো হ বৈ নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা নেশানো নেমে দ্যাবাপৃথিবী ন নক্ষত্রাণি নাপো নাগ্নির্ন সোমো ন সূর্য্যঃ স একাকী ন রমতে তস্য ধ্যানান্তস্থস্যৈকা কন্যা দশেন্দ্রিয়াণি' ইত্যাদিষু 'যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তর' ইত্যারভ্য 'য আত্মনি তিষ্ঠন্ ইত্যাদিষু চ নিখিলজগন্নিয়মনং পরমপুরুষং প্রকৃত্যৈব শ্রূয়তে' অসন্নিহিতত্বাচ্চ, ন চৈতেষু নিখিলজগন্নিয়মনপ্রসঙ্গেষু মুক্তস্য সন্নিধানমস্তি যেন জগদ্ব্যাপারস্তস্যাপি স্যাৎ। —ব্রহ্মসূত্র, ৪ অঃ, ৪ পাঃ, ১৭ সূত্র, রামানুজভাষ্য

* "প্রত্যক্ষোপদেশান্নেতিচেন্নাধিকারিকমণ্ডলস্থোক্তেঃ।" এই সূত্রের (ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১৮) রামানুজভাষ্য দেখ।

এক্ষণে আমরা অদ্বৈতমতের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাতা এই বিষয়ে কি বলেন, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব। আমরা দেখিব, অদ্বৈতমত কেমন দ্বৈতবাদীর সমুদয় আশা আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিতেছেন, আবার তৎসঙ্গে-সঙ্গেই ব্রহ্মভাবাপন্ন মানবজাতির মহোচ্চ চরম গতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া নিজ সিদ্ধান্তও স্থাপন করিতেছেন। যাঁহারা মুক্তিলাভের পরও আপনাদের ব্যক্তিত্বরক্ষার ইচ্ছা করেন, ভগবান্ হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে চান, তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার ও সগুণ ব্রহ্মকে সম্ভোগ করিবার যথেষ্ট অবসর থাকিবে। ইঁহাদেরই কথা ভাগবতপুরাণে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—"হে রাজন্, হরির এতাদৃশ গুণরাশি যে, যে-সকল মুনি আত্মারাম, যাঁহাদের সমুদয় বন্ধন চলিয়া গিয়াছে, তাঁহারাও ভগবানের প্রতি অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।" *

সাংখ্যে ইঁহারাই প্রকৃতিলীন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। সিদ্ধিলাভ করিয়া ইঁহারা পরকল্পে কতকগুলি জগতের শাসনকর্ত্তারূপে উৎপন্ন হন। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে কেহই কখন ঈশ্বরতুল্য হইতে পারেন না। যাঁহারা এমন এক অবস্থায় উপনীত হন যেখানে সৃষ্টি, সৃষ্ট বা স্রষ্টা নাই; যেখানে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় বা জ্ঞান নাই; যেখানে আমি, তুমি বা তিনি নাই; যেখানে প্রমাতা, প্রমেয় বা প্রমাণ নাই; "সেখানে কে কাহাকে দেখে?" এরূপ লোক সমুদয়ের বাহিরে গিয়াছেন, "যেখানে বাক্য অথবা মনও যাইতে পারে না,"

* আত্মারামাশ্চ মুনয়োনির্গ্রন্থাঽপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥
—শ্রীমদ্ভাগবত, ১ম স্কন্ধ, ৭ম অধ্যায়, ১০ম শ্লোক

এমন স্থানে গিয়াছেন। যাহাকে শ্রুতি 'নেতি', 'নেতি' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু যাঁহারা এরূপ অবস্থা লাভ করিতে পারেন না বা এরূপ অবস্থায় যাইতে ইচ্ছা করেন না, তাঁহারা সেই এক অবিভক্ত ব্রহ্মকে প্রকৃতি, আত্মা ঐ উভয়ের অন্তর্যামী ঈশ্বর এই ত্রিধা-বিভক্ত-রূপে দেখিবেন। যখন প্রহ্লাদ আপনাকে ভুলিয়া গেলেন, তখন তিনি জগৎ ও তাহার কারণ কিছুই ত দেখিতে পাইলেন না, সমুদয়ই তাঁহার নিকট নামরূপে অবিভক্ত, এক অনন্তরূপে প্রতীয়মান হইয়াছিল। কিন্তু যখনই তাঁহার বোধ হইল, আমি প্রহ্লাদ, অমনি তাঁহার নিকট জগৎ ও অশেষকল্যাণগুণ-রাশির আধারস্বরূপ জগদীশ্বর প্রকাশিত হইলেন। মহাভাগা গোপীদিগেরও এই অবস্থা ঘটিয়াছিল। যতক্ষণ তাঁহারা অহংজ্ঞান-শূন্য ছিলেন, ততক্ষণ তাঁহারা সকলেই কৃষ্ণরূপে পরিণত হইয়াছিলেন। যখন তাঁহারা আবার তাঁহাকে উপাস্যরূপে ভেদভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহারা আবার গোপীভাব প্রাপ্ত হইলেন। তখনই "তাঁহাদের সম্মুখে মুখকমলে মৃদুহাস্যযুত, পীতাম্বরধারী, মাল্যভূষিত ও সাক্ষাৎ মন্মথের মন-মথনকারী কৃষ্ণ আবির্ভূত হইলেন।"*

এক্ষণে আচার্য শঙ্করের কথা ধরা যাউক। শঙ্কর বলেন, "যাঁহারা সগুণব্রহ্মোপাসনাবলে পরমেশ্বরের সহিত একীভূত হন, অথচ যাঁহাদের মন অব্যাহত থাকে, তাঁহাদের ঐশ্বর্য সসীম কি

* তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ॥
—শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ, ৩২শ অধ্যায়, ২য় শ্লোক

অসীম? এই সংশয় উপস্থিত হইলে পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত হয় যে তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য অসীম, কারণ শাস্ত্রে পাওয়া যায় 'তিনি স্বারাজ্য লাভ করেন,' 'সমুদয় দেবতা তাঁহার পূজা করেন,' 'সমুদয় জগতে তাঁহার কামনার পূর্ত্তি হয়।' ইহার উত্তরে ব্যাস বলেন, 'জগতের সৃষ্ট্যাদি ব্যতীত।' মুক্তাত্মাগণ জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় ব্যতীত অণিমাদি অন্যান্য শক্তি লাভ করেন। জগতের নিয়ন্তৃত্ব কেবল নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরের। কারণ সৃষ্টিসম্বন্ধে যত শাস্ত্রীয় বচন আছে, সকলগুলিতে তিনিই কথিত হইয়াছেন। তৎস্থলে মুক্তাত্মার কোন প্রসঙ্গ নাই। সেই মহাপুরুষই কেবল জগন্নিয়ন্তৃত্বে নিযুক্ত। সৃষ্ট্যাদি বিষয়ে যতগুলি শ্লোক আছে, সকলগুলিই তাঁহাকে লক্ষ্য করিতেছে। আর 'নিত্যসিদ্ধ' এই বিশেষণও প্রদত্ত হইয়াছে। আরও শাস্ত্র বলেন যে, অপরের অণিমাদিশক্তি ঈশ্বরের উপাসনা ও ঈশ্বরান্বেষণ হইতেই লব্ধ হয়। সেই শক্তিগুলি অসীম নহে। সুতরাং জগতের নিয়ন্তৃত্ববিষয়ে তাঁহাদের কোন স্থান নাই। আবার, তাঁহাদের নিজ নিজ মনের অস্তিত্ব-বশতঃ এরূপ সম্ভব যে, পরস্পরের ইচ্ছা ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে। একজন হয়ত সৃষ্টি ইচ্ছা করিলেন, অপরে নাশ ইচ্ছা করিলেন। এই গোল এড়াইবার একমাত্র উপায়—সমুদয় ইচ্ছা এক ইচ্ছার অধীন হওয়া। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে মুক্ত পুরুষগণের ইচ্ছা সেই পরম পুরুষের অধীন।"*

* যে সগুণব্রহ্মোপাসনাৎ সহৈব মনসেশ্বরসাযুজ্যং ব্রজন্তি কিন্তেষাং নিরবগ্রহ-মৈশ্বর্য্যং ভবত্যাহোস্বিৎ সাবগ্রহমিতি সংশয়ঃ। কিন্তাবৎ প্রাপ্তম্? নিরঙ্কুশমেবৈষা-মৈশ্বর্য্যং ভবিতুমর্হতি 'আপ্নোতি, স্বারাজ্যম্' 'সর্ব্বেঽস্মৈ দেবা বলিমাবহন্তি'

অতএব ভক্তি সগুণ ব্রহ্মের প্রতি প্রয়োগই সম্ভব। "দেহাভিমানী ব্যক্তি দুঃখে সেই অব্যক্ত গতিলাভ করিয়া থাকে।"* ভক্তি আমাদের প্রকৃতিস্রোতের সহিত সামঞ্জস্যভাবে প্রবাহিত। আমরা ব্রহ্মের মানবীয় ভাব ব্যতীত অপর কোন ভাব ধারণা করিতে পারি না, ইহা সত্য কথা। কিন্তু বাস্তবিক আমাদের জ্ঞাত আর সকল বস্তুর সম্বন্ধেও কি ইহা সত্য নহে? জগতের সর্ব্বোচ্চ মনোবিজ্ঞানবিৎ ভগবান্ কপিল সহস্রবর্ষ পূর্ব্বে প্রমাণ করিয়াছেন যে, আমাদের বাহ্য বা আন্তর সর্ব্বপ্রকার বিষয়বিজ্ঞান বা ধারণার মধ্যেই মানবীয় জ্ঞান একটি উপাদান। শরীর হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশ্বর পর্য্যন্ত বিচার করিলে দেখিতে পাইব, আমাদের অনুভূত সমুদয় বস্তুই জ্ঞান ও তাহার সহিত অপর এক বস্তুর মিশ্রণ, তা সেটি যাহাই হউক। আর এই অবশ্যম্ভাবী মিশ্রণ তাহাই—যাহাকে আমরা

'তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি' ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ—ইত্যেবং প্রাপ্তে পঠতি।—জগদ্ব্যাপারবর্জ্জমিতি। জগদুৎপত্ত্যাদি ব্যাপারং বর্জ্জয়িত্বাঽন্যদণিমাদ্যাত্মকমৈশ্বর্য্যং মুক্তানাং ভবিতুমর্হতি, জগদ্ব্যাপারস্তু নিত্যসিদ্ধস্যৈবেশ্বরস্য। কুতঃ? তস্য তত্র প্রকৃতত্বাদসন্নিহিতত্বাচ্চেতরেষাম্। পর এব হীশ্বরো জগদ্ব্যাপারেঽধিকৃতঃ তমেব প্রকৃত্যোৎপত্ত্যাদ্যুপদেশান্নিত্যশব্দনিবন্ধনত্বাচ্চ। তদন্বেষণবিজিজ্ঞাসনপূর্ব্বকমিতরেষামাদিমদৈশ্বর্য্যং শ্রূয়তে। তেনাসন্নিহিতাস্তে জগদ্ব্যাপারে। সমনস্কত্বাদেব চৈষামনৈকমত্যে কস্যচিৎ স্থিত্যভিপ্রায়ঃ, কস্যচিৎ সংহারাভিপ্রায় ইত্যেবং বিরোধোঽপি কদাচিৎ স্যাৎ। অথ কস্যচিৎ সঙ্কল্পমন্বন্যস্য সঙ্কল্প ইত্যবিরোধঃ সমর্থ্যেত, ততঃ পরমেশ্বরাকূততন্ত্রত্বমেবেতরেষামিতি ব্যবতিষ্ঠন্তে।

—ব্রহ্মসূত্র, ৪ অঃ, ৪ পাঃ, ১৭ সূঃ, শাঙ্কর-ভাষ্য

* অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে।

—ভগবদ্গীতা, ১২ অঃ, ৫ম শ্লোক

সচরাচর সত্য বলিয়া বোধ করি। বাস্তবিকই বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ মানবমনের পক্ষে সত্যের জ্ঞান যতদূর সম্ভব, তাহা ইহার অতিরিক্ত আর কিছু নহে। অতএব ঈশ্বর মানবধর্ম্মক বলিয়া তাঁহাকে অসত্য বলা অসম্বন্ধ প্রলাপমাত্র। এ যেন পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানবাদ (Idealism) ও সর্ব্বাস্তিত্ববাদের (Realism) মধ্যে বিচারসদৃশ। ঐ বিবাদ আপাততঃ শুনিতে অতি ভয়ানক বোধ হইলেও, বাস্তবিক 'সত্য' শব্দের অর্থ লইয়া মারপেঁচের উপর স্থাপিত। সত্য শব্দের দ্বারা যত প্রকার ভাব সূচিত হইয়াছে, 'ঈশ্বরভাবটি' তৎসমুদয়ভাবব্যঞ্জক। জগতের অন্যান্য বস্তু যতদূর সত্য, ঈশ্বরও ততদূর সত্য। আর বাস্তবিক সত্য শব্দ এখানে যে অর্থে প্রযুক্ত হইল, সত্য শব্দে তদপেক্ষা অধিক কিছু বুঝায় না। ইহাই আমাদের ঈশ্বরসম্বন্ধীয় দার্শনিক ধারণা।

প্রত্যক্ষানুভূতিই ধর্ম্ম

ভক্তের পক্ষে এই সকল শুষ্ক বিষয় জানার প্রয়োজন—কেবল নিজ ইচ্ছাশক্তিকে দৃঢ় করা মাত্র। এতদ্ব্যতীত উহাদের আর কোন উপযোগিতা নাই। কারণ তিনি এমন এক পথে বিচরণ করিতেছেন, যাহা শীঘ্রই তাঁহাকে যুক্তির কুহেলিকাময় ও অশান্তি-প্রদ রাজ্যের সীমা ছাড়াইয়া প্রত্যক্ষানুভূতির রাজ্যে লইয়া যাইবে; তিনি শীঘ্রই ঈশ্বরকৃপায় এমন এক অবস্থায় উপনীত হন, যেখানে পাণ্ডিত্যাভিমানিগণের প্রিয় অক্ষম যুক্তি অনেক পশ্চাতে পড়িয়া থাকে, আর বুদ্ধির সাহায্যে অন্ধকারে বৃথান্বেষণের স্থানে প্রত্যক্ষা-নুভূতির উজ্জ্বল দিবালোকের প্রকাশ হয়। তিনি তখন বিচার বা বিশ্বাস কিছুই করেন না। তিনি একরূপ প্রত্যক্ষ অনুভব করেন। তিনি আর তর্ক করেন না, প্রত্যক্ষ করেন। আর এই ভগবান্‌কে দেখা, তাঁহাকে উপলব্ধি করা ও তাঁহাকে সম্ভোগ করা কি অন্যান্য সমুদয় বিষয় হইতে শ্রেষ্ঠ নহে? শুধু ইহাই নহে, অনেক ভক্ত আছেন যাঁহারা ভক্তিকে মুক্তি হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আর ইহা কি আমাদের জীবনের সর্ব্বোচ্চ প্রয়োজনও নহে? এমন লোক জগতে আছেন, তাঁহাদের সংখ্যাও অনেক, যাঁহারা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যাহা মানুষকে পাশব সুখ প্রদান করিতে পারে তাহাতেই বাস্তবিক প্রয়োজন ও উপকারিতা আছে। ধর্ম্মই বল, ঈশ্বরই বল, পরকালই বল, আত্মাই বল এগুলিও কোন কাজের নয়, যদি ইহাদের দ্বারা অর্থ বা দৈহিক সুখ

না পাওয়া যায়। এরূপ লোকের মতে যাহাতে তাঁহাদের ইন্দ্রিয় চরিতার্থ না হয়, যাহাতে তাঁহাদের পরিপূর্ত্তি না হয়, তাহাতে কোন প্রয়োজন নাই। যে ব্যক্তির আবার যে বিষয়ে আগ্রহ প্রবল, তাহার তাহাতেই অধিক লাভবোধ। সুতরাং যাঁহারা পান, ভোজন, অপত্যোৎপাদন ও তৎপরে মৃত্যু—ইহার উপর আর উঠিতে পারেন না, তাঁহাদের পক্ষে লাভবোধ কেবল ইন্দ্রিয়ের সুখে। তাঁহাদিগের হৃদয়ে উচ্চতর বিষয়ের জন্য সামান্য ব্যাকুলতা পর্য্যন্ত জন্মিতে অনেক জন্ম লাগিবে। যাঁহাদের চক্ষে কিন্তু আত্মার উন্নতিসাধন ঐহিক জীবনের ক্ষণিক সুখাপেক্ষা গুরুতর বোধ হয়, যাঁহাদের চক্ষে ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি কেবল অবোধ শিশুর ক্রীড়াপ্রায় বোধ হয়, তাঁহাদের নিকট ভগবান্ ও ভগবৎ-প্রেমই মানবজীবনের সর্ব্বোচ্চ ও একমাত্র প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হয়। ঈশ্বরেচ্ছায় এই ঘোর ভোগলিপ্সাপূর্ণ জগতে এখনও এইরূপ মহাত্মা বিরল নহেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভক্তি পরা ও গৌণী এই দুই ভাগে বিভক্ত। গৌণী অর্থ সাধনভক্তি; পরাভক্তি উহারই পরিপক্কাবস্থা। ক্রমশঃ বুঝিতে পারিব, এই ভক্তিমার্গে অগ্রসর হইতে হইলে সাধনাবস্থায় কতকগুলি বাহ্য সহায় না লইলে চলে না। বাস্তবিক সকল ধর্ম্মের পৌরাণিক ও রূপক ভাগই আপনা আপনি আসিয়া থাকে এবং প্রথমাবস্থায় উন্নতিকামী আত্মাকে ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে সাহায্য করে। আরও ইহা একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, যে-সকল ধর্ম্মপ্রণালী পৌরাণিকভাববহুল ও অনুষ্ঠানপ্রচুর সেই সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়েই বড় বড় ধর্ম্মবীর জন্মিয়াছিলেন। যে-সকল

শুষ্ক গোঁড়ামিপূর্ণ ধর্ম্মপ্রণালীতে যাহা কিছু কবিত্বময়, যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মহান্, যাহা কিছু ভগবৎপথে স্খলিতপদে অগ্রসর সুকুমার মনের দৃঢ় অবলম্বন-স্বরূপ সেই সমুদয় ভাবগুলিকে একেবারে উৎপাটন করিয়া ফেলিতে চাহে, যে-সকল প্রণালীতে ধর্ম্মরূপ ছাদের অবলম্বন-স্তম্ভগুলিকে পর্য্যন্ত ভঙ্গ করিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে এবং সত্য সম্বন্ধে অজ্ঞান ও ভ্রমপূর্ণ ধারণা লইয়া যাহা কিছু জীবনীশক্তিসঞ্চারক, যাহা কিছু মানবাত্মারূপ ক্ষেত্রে উৎপাদ্যমান্ ধর্ম্মরূপ লতিকার গঠনোপযোগী উপাদান তাহাদিগকে পর্য্যন্ত দূর করিয়া দিতে চাহে, সেই সকল ধর্ম্ম শীঘ্রই দেখিতে পাওয়া যায় যে, কেবল অন্তঃসারশূন্য একটি আধারমাত্র, অনন্ত শব্দরাশি ও তর্কাভাসের স্তূপমাত্র, হয়ত একটু সামাজিক আবর্জ্জনানিরাকরণ বা তথাকথিত সংস্কারপ্রিয়তার গন্ধযুক্ত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। যাহাদের ধর্ম্ম এইরূপ, তাহাদের মধ্যে অনেকেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে জড়বাদী; তাহাদের ঐহিক পারত্রিক জীবনের লক্ষ্য কেবল ভোগ; উহাই তাহাদের মতে মানবজীবনের সর্ব্বস্ব, উহাই তাহাদের ইষ্টাপূর্ত্ত। মানুষের ঐহিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অভিপ্রেত রাস্তা ঝাঁট দেওয়া প্রভৃতি কার্য্যই ইহাদের মতে মানব-জীবনের সর্ব্বস্ব। এই অজ্ঞান ও গোঁড়ামির অদ্ভুত মিশ্রণরূপ-মতাবলম্বিগণ যত শীঘ্র তাহাদের প্রকৃত বেশে বাহির হইয়া নাস্তিক জড়বাদীদের দলে যোগ দেয় (ইহাই তাহাদের পক্ষে উপযুক্ত) ততই সংসারের মঙ্গল। একবিন্দু ধর্ম্মানুষ্ঠান ও অপরোক্ষানুভূতি রাশি রাশি বাক্‌প্রপঞ্চ ও মূর্খ-সুলভ ভাবোচ্ছ্বাস হইতে সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠতর। অজ্ঞান ও গোঁড়ামির এই শুষ্ক ধূলিময়

ক্ষেত্রে একজন—কেবলমাত্র একজন অমিততেজা ধর্ম্মবীর জন্মিয়াছেন, দেখাইতে পার? না পার চুপ কর। হৃদয়ের কপাট খুলিয়া দাও, সত্যের বিমলালোক প্রবেশ করুক, আর যাঁহারা না বুঝিয়া কিছু বলেন না, সেই ভারতীয় সাধুগণের পদতলে বালকের ন্যায় বসিয়া তাঁহারা কি বলিতেছেন শুন। তবে এস, তাঁহারা কি বলেন অবধানপূর্ব্বক শ্রবণ করি।

গুরুর প্রয়োজনীয়তা

জীবাত্মামাত্রেই পূর্ণতা লাভ করিবেই করিবে—চরমে সকলেই সিদ্ধাবস্থা লাভ করিবে। (আমরা এখন যাহা, তাহা আমাদের অতীত কার্য্য ও চিন্তারাশির ফলস্বরূপ।) আর এক্ষণে যেরূপ চিন্তা ও কার্য্য করিতেছি, ভবিষ্যতে তাহাই হইব। কিন্তু আমরা নিজেরাই নিজেদের অদৃষ্ট গঠন করিতেছি বলিয়া যে বাহির হইতে আমাদের কোন সহায়তার আবশ্যক নাই, তাহা নহে। বরং অধিকাংশ স্থলে, এরূপ সহায়তা সম্পূর্ণ প্রয়োজন। যখন আমরা এই সহায়তা প্রাপ্ত হই, তখন আত্মার উচ্চতর শক্তি ও আপাত-অব্যক্ত ভাবগুলি ফুটিয়া উঠে, আধ্যাত্মিক জীবন সতেজ হইয়া উঠে, উহার উন্নতি ত্বরান্বিত হয়, সাধক অবশেষে শুদ্ধস্বভাব ও সিদ্ধ হইয়া যায়।

(এই সঞ্জীবনী শক্তি গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায় না। আত্মা কেবল অপর এক আত্মা হইতে শক্তি প্রাপ্ত হইতে পারে, আর কিছু হইতেই নহে।) সারাজীবন পুস্তক পাঠ করিতে পারি, খুব একজন বুদ্ধিজীবী হইয়া উঠিতে পারি, কিন্তু শেষে দেখিব আধ্যাত্মিক উন্নতি কিছুই হয় নাই। বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি হইলেই যে সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক উন্নতিও খুব হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। গ্রন্থপাঠ করিতে করিতে অনেক সময় ভ্রমবশতঃ ভাবি, আমরা আধ্যাত্মিক উপকার লাভ করিতেছি। কিন্তু যদি গ্রন্থপাঠে আমাদের কি ফল হইয়াছে তাহা ধীরভাবে আলোচনা

করি, তবে দেখিব বড় জোর আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি একটু সতেজ হইয়াছে, অন্তরাত্মার কিছুই হয় নাই। আমাদের মধ্যে প্রায় সকলেরই আধ্যাত্মিক বাক্যবিন্যাসে অদ্ভুত নৈপুণ্য থাকিলেও কার্য্যের সময়—প্রকৃত ধর্ম্মভাবে জীবন-যাপন করিবার সময়—কেন এত ভয়ানক ন্যূনতা লক্ষিত হয়, তাহার কারণ গ্রন্থরাশি আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতির পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। (জীবাত্মার শক্তি জাগ্রত করিতে হইলে অপর এক আত্মার শক্তিসঞ্চার আবশ্যক।)

যে ব্যক্তির আত্মা হইতে অপর আত্মায় শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাঁহাকে গুরু বলে এবং যে ব্যক্তির আত্মায় শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাঁহাকে শিষ্য বলে।) এইরূপ শক্তিসঞ্চার করিতে হইলে প্রথমতঃ যিনি সঞ্চার করিবেন, তাঁহার এই সঞ্চারের শক্তি থাকা আবশ্যক। আর যাঁহাতে সঞ্চারিত হইবে, তাঁহারও গ্রহণের শক্তি থাকা আবশ্যক। বীজ সতেজ হওয়া আবশ্যক, ভূমিও সুকৃষ্ট থাকা আবশ্যক।) যেখানে এই উভয়টি বিদ্যমান, সেইখানেই প্রকৃত ধর্ম্মের অপূর্ব্ব বিকাশ দৃষ্ট হয়। "ধর্ম্মের প্রকৃত বক্তাও আশ্চর্য্য, শ্রোতার সুনিপুণ হওয়াও আবশ্যক।"* যখন উভয়েই আশ্চর্য্য ও অসাধারণ হয়, তখনই আশ্চর্য্য আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটে, অন্যস্থলে নহে। এইরূপ ব্যক্তিই প্রকৃত গুরু, এইরূপ ব্যক্তিই প্রকৃত শিষ্য—মুমুক্ষু। আর সকলে ধর্ম্ম লইয়া ছেলেখেলা করে মাত্র। তাহাদের কেবল একটু কৌতূহল, একটু জানিবার ইচ্ছামাত্র হইয়াছে। কিন্তু তাহারা এখনও ধর্ম্মচক্রবালের

* আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা ইত্যাদি।

—কঠ উপনিষৎ, ১ম অধ্যায়, ২য় বল্লী, ৭ম শ্লোক

বহির্দ্দেশে রহিয়াছে। অবশ্য ইহারও কিছু মূল্য আছে; কারণ সময়ে ইহা হইতেই প্রকৃত ধর্ম্ম-পিপাসা আসিতে পারে। আর প্রকৃতির এই বিচিত্র নিয়ম যে, যখনই ক্ষেত্র উপযুক্ত হয় তখনই বীজ নিশ্চয়ই আসিবে, আসিয়াও থাকে। যখনই আত্মার ধর্ম্ম-পিপাসা প্রবল হইবে, তখনই ধর্ম্মশক্তিসঞ্চারক পুরুষ সেই আত্মার সহায়তার জন্ম অবশ্যই আসিবেন, আসিয়াও থাকেন। যখন গ্রহীতার আত্মার ধর্ম্মালোকাকর্ষিণী শক্তি পূর্ণা ও প্রবলা হয়, তখন সেই আকর্ষণে আকৃষ্টা আলোকদায়িনী শক্তি অবশ্য আসিয়া থাকে।

তবে পথে কতকগুলি মহাবিঘ্ন আছে, যথা—ক্ষণস্থায়ী ভাবোচ্ছ্বাসকে প্রকৃত ধর্ম্ম-পিপাসা বলিয়া ভ্রম হইবার সম্ভাবনা। আমরা নিজেদের জীবনেই ইহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারি। আমাদের জীবনে অনেক সময়ে এরূপ দেখা যায়—হয়ত কাহাকেও খুব ভালবাসিতাম, তাহার মৃত্যু হইল, আঘাত পাইলাম। মনে হইল, যাহা ধরিতেছি তাহাই হাত ফস্‌কাইয়া পলাইতেছে, এক্ষণে কোন দৃঢ়তর উচ্চতর আশ্রয় আবশ্যক—আমাদিগকে অবশ্যই ধর্ম্ম করিতে হইবে। কয়েক দিনেই ঐ ভাবতরঙ্গ কোথায় চলিয়া গেল! আমরা যেখানে ছিলাম সেখানেই পড়িয়া রহিলাম। আমরা সকলেই এই-রূপ ভাবোচ্ছ্বাসকে প্রকৃত ধর্ম্ম-পিপাসা বলিয়া অনেক সময়েই ভ্রমে পড়িতেছি। কিন্তু যতদিন এই ক্ষণস্থায়ী ভাবোচ্ছ্বাসগুলিকে ভ্রমবশে প্রকৃত ধর্ম্ম-পিপাসা মনে করিব, ততদিন ধর্ম্মের জন্ম যথার্থ স্থায়ী প্রাণের ব্যাকুলতা জন্মিবে না, আর ততদিন শক্তিসঞ্চারকারী পুরুষেরও সাক্ষাৎকারলাভ হইবে না। এই কারণে যখনই আমাদের মনে হয়, আমাদের সত্যলাভের জন্ম এই চেষ্টাসমুদয় বৃথা

হইতেছে, তখনই ঐরূপ মনে করা অপেক্ষা নিজেদের অন্তরের অন্তস্তলে অন্বেষণ করিয়া দেখা উচিত, হৃদয়ে প্রকৃত আগ্রহ জন্মিয়াছে কি না। এইরূপ করিলে অধিকাংশ স্থলেই আমরা দেখিব, আমরা সত্যগ্রহণের উপযুক্ত নহি—আমাদের প্রকৃত ধর্ম্ম-পিপাসা হয় নাই।

আবার শক্তিসঞ্চারক গুরু সম্বন্ধে আরো অনেক বিঘ্ন আছে। অনেকে আছেন, যাঁহারা স্বয়ং অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়াও অহঙ্কারে আপনাদিগকে সর্ব্বজ্ঞ মনে করেন, শুধু তাহাই নহে, অপরকেও নিজ স্কন্ধে লইয়া যাইবেন বলিয়া ঘোষণা করেন। এইরূপে অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে যাইতে উভয়েই খানায় পড়িয়া যায়। "অজ্ঞানে আচ্ছন্ন, অতি নির্ব্বুদ্ধি হইলেও আপনাকে মহাপণ্ডিত মনে করিয়া মূঢ় ব্যক্তিগণ অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধের ন্যায় প্রতিপদবিক্ষেপেই স্খলিতপদ হইয়া চতুর্দ্দিকে বিচরণ করে।"*

জগৎ এতদ্বিধ জনগণে পরিপূর্ণ—সকলেই গুরু হইতে চাহে, "আপনি শুতে স্থান পায় না, শঙ্করাকে ডাকে।" এইরূপ লোক যেরূপ সকলের নিকট হাস্যাস্পদ হয়, এই সকল আচার্য্যেরাও তদ্রূপ।

* অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥
—মুণ্ডক উপনিষৎ, ১ম মুণ্ডক, ২য় খণ্ড, ৮ম শ্লোক

গুরু ও শিষ্যের লক্ষণ

তবে গুরু চিনিব কিরূপে? সূর্য্যকে প্রকাশ করিতে আর মশালের আবশ্যক হয় না। তাঁহাকে দেখিবার জন্য আর বাতি জ্বালিতে হয় না। সূর্য্য উঠিলে আমরা আপনা আপনি জানিতে পারি যে উহা উঠিয়াছে; আর জীবোদ্ধারের জন্য লোক-গুরুর আগমন হইলে আত্মা স্বভাবতঃই জানিতে পারেন যে, তাঁহার উপর সত্যের সূর্য্যালোক পতিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সত্য স্বতঃপ্রমাণ—উহা প্রমাণ করিতে অপর কোন সাক্ষ্যের প্রয়োজন নাই—উহা স্বপ্রকাশ; উহা আমাদের প্রকৃতির অন্তঃস্থলে প্রবেশ করে—উহার সমক্ষে সমস্ত জগৎ দাঁড়াইয়া বলে—'ইহাই সত্য।' যে সকল আচার্য্যের হৃদয়ে জ্ঞান ও সত্য সূর্য্যালোকের ন্যায় প্রতিভাত, তাঁহারা জগতের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ মহাপুরুষ, আর জগতের অধিকাংশ লোকেই তাঁহাদিগকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করে। কিন্তু আমরা অপেক্ষাকৃত অল্পজ্ঞানিগণের নিকটও আধ্যাত্মিক সাহায্য লাভ করিতে পারি। তবে আমাদের এরূপ অন্তর্দৃষ্টি নাই যে, আমরা আমাদের আচার্য্যের সম্বন্ধে যথার্থ বিচার করিতে পারি; এই কারণে গুরুশিষ্য উভয়ের সম্বন্ধেই কতকগুলি পরীক্ষা আবশ্যক।

শিষ্যের এই গুণগুলি আবশ্যক—পবিত্রতা, প্রকৃত জ্ঞানপিপাসা ও অধ্যবসায়। অশুদ্ধাত্মা পুরুষ কখনও প্রকৃত ধার্ম্মিক হইতে পারে না। কায়মনোবাক্যে পবিত্র না হইলে কেহ কখন ধার্ম্মিক হইতে পারে না, আর জ্ঞানতৃষ্ণা সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে

পারে যে, আমরা যাহা চাই তাহাই পাই, ইহা একটি সনাতন সত্য। আমরা যে বস্তু অন্তরের সহিত অনুসন্ধান না করি, আমরা সে বস্তু লাভ করিতে পারি না। ধর্ম্মের জন্য প্রকৃত ব্যাকুলতা বড় কঠিন জিনিস—আমরা সচরাচর উহা যত সোজা মনে করি, উহা তত সোজা নহে। শুধু ধর্ম্মকথা শুনিলে ও ধর্ম্মপুস্তক পড়িলেই যে বাস্তবিক হৃদয়ে ধর্ম্মভাব প্রবল হইয়াছে, তাহা প্রমাণ হয় না। যতদিন পর্য্যন্ত ব্যাকুলতা প্রাণে জাগরিত না হয় এবং আমরা প্রবৃত্তির উপর জয়লাভ না করিতে পারি, ততদিন সদাসর্ব্বদা অভ্যাস ও আমাদের পাশব প্রকৃতির সহিত নিরন্তর সংগ্রাম আবশ্যক। উহা দু-এক দিনের কর্ম্ম নহে, কতিপয় বর্ষ বা কতিপয় জন্মেরও কর্ম্ম নহে; শত শত জন্ম ধরিয়া এই সংগ্রাম চলিতে পারে। সিদ্ধিলাভ কাহারও পক্ষে অল্পকালের মধ্যে ঘটিতে পারে, কিন্তু যদি অনন্তকালও অপেক্ষা করিতে হয়, ধৈর্য্যের সহিত তাহার জন্যও প্রস্তুত থাকা আবশ্যক। যে শিষ্য এইরূপ অধ্যবসায়সহকারে সাধনে প্রবৃত্ত হয়, তাহার সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী।

গুরুর সম্বন্ধে এইটুকু বুঝা আবশ্যক যে, তিনি যেন শাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হন। জগতের সকলেই বেদ-বাইবেল-কোরাণ-পাঠে অনুরক্ত। উহারা ত শব্দ সমষ্টিমাত্র—ধর্ম্মের কয়েকখানা শুকনো হাড়মাত্র। যে গুরু শব্দ লইয়া বেশী নাড়াচাড়া করেন ও মনকে কেবল শব্দের শক্তির দ্বারা চালিত হইতে দেন, তিনি ভাব হারাইয়া ফেলেন। শাস্ত্রের মর্ম্ম যিনি জানেন, তিনিই যথার্থ ধর্ম্মাচার্য্য। শাস্ত্রের শব্দজাল যেন মহাবনস্বরূপ, মানুষ আপনাকে উহার ভিতর হারাইয়া ফেলে, পথ খুঁজিয়া পায় না। "শব্দজাল মহাবনসদৃশ,

চিত্তের ভ্রমণের কারণ।" * "শব্দযোজনা, সুন্দর ভাষায় বক্তৃতা ও শাস্ত্রমর্ম্ম ব্যাখ্যা করিবার বিভিন্ন উপায়—পণ্ডিতদিগের বিচার ও আমোদের বিষয়মাত্র, উহা দ্বারা অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ হয় না।" † যাহারা ধর্ম্মব্যাখ্যার সময় এইরূপ প্রণালী অবলম্বন করে, তাহারা কেবল আপনাদের পাণ্ডিত্য দেখাইতে ইচ্ছুক, তাহাদের ইচ্ছা—লোকে আমাদিগকে মহাপণ্ডিত বলিয়া সম্মান করুক। জগতের কোন প্রধান ধর্ম্মাচার্য্যই এইরূপ শাস্ত্রের নানাবিধ ব্যাখ্যায় অগ্রসর হন নাই। তাঁহারা শাস্ত্রের শ্লোকের অর্থ যথেচ্ছ ব্যাখ্যা করিতে কখন চেষ্টা করেন নাই। শব্দার্থ ও ধাত্বর্থ লইয়া ক্রমাগত মারপেঁচ করেন নাই। শুধু তাঁহারা জগৎকে অতি সুন্দর শিক্ষা দিয়াছেন। আর যাঁহাদের কিছু শিখাইবার নাই, তাঁহারা হয়ত একটি শব্দ লইয়া তাহারই উপর এক তিনখণ্ড-পুস্তক রচনা করিলেন। সেই শব্দের আদি কি, কে ঐ শব্দটি প্রথম ব্যবহার করিত, সে কি খাইত, কতক্ষণ ঘুমাইত, এইরূপ বিষয় লইয়াই তিনি হয়ত আলোচনা করিয়া গেলেন।

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ একটি গল্প বলিতেন—"এক বাগানে দুজন লোক বেড়াতে গিছলো; তার ভিতর যার বিষয়বুদ্ধি বেশী, সে বাগানে ঢুকেই কটা আম গাছ, কোন্ গাছে কত আম হয়েছে,

---

* শব্দজালং মহারণ্যং চিত্তভ্রমণকারণম্।

—বিবেকচূড়ামণি, ৬০ শ্লোক

† বাগ্বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলম্।
বৈদুষ্যং বিদুষাং তদ্বদ্ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে॥

—বিবেকচূড়ামণি, ৫৮ শ্লোক

এক-একটা ডালে কত পাতা, বাগানটির কত দাম হতে পারে ইত্যাদি নানারকম বিচার করতে লাগলো। আর একজন বাগানের মালিকের সঙ্গে আলাপ করে গাছতলায় বসে একটি করে আম পাড়তে লাগলো আর খেতে লাগলো। বল দেখি, কে বুদ্ধিমান? আম খাও, পেট ভরবে, কেবল পাতা গুণে হিসাব-কিতাব করে লাভ কি?" এই পাতা-ডালপালা-গণা ও অপরকে উহার সংখ্যা জানাইবার চেষ্টা একেবারে ছাড়িয়া দাও। অবশ্য ইহারও উপযোগিতা আছে, কিন্তু ধর্ম্মরাজ্যে নহে। যাহারা এইরূপ পাতা গণিয়া বেড়ায়, তাহাদের ভিতর হইতে একটিও ধর্ম্মবীর বাহির করিতে পারিবে না। ধর্ম্ম—যাহা মানবজীবনের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য, মানুষের সর্ব্বোচ্চ গৌরবের জিনিস, তাহাতে পাতা-গণারূপ অত পরিশ্রমের আবশ্যক করে না। যদি তুমি ভক্ত হইতে চাও, তাহা হইলে কৃষ্ণ মথুরায় কি ব্রজে জন্মিয়াছিলেন, তিনি কি করিয়াছিলেন বা ঠিক কোন্ দিনে গীতা বলিয়াছিলেন, তাহা জানিবার কিছু আবশ্যক নাই। গীতায় যে কর্ত্তব্য ও প্রেমসম্বন্ধীয় সুন্দর শিক্ষা আছে, আগ্রহের সহিত তাহার অনুসরণ করাই তোমার আবশ্যক। উহার সম্বন্ধে অথবা উহার প্রণেতার সম্বন্ধে অন্যান্য বিশেষ বিবরণ জানা কেবল পণ্ডিতদের আমোদের জন্য। তাহারা যাহা চায় তাহা লইয়াই থাকুক। তাহাদের পণ্ডিতী তর্কবিচারে শান্তিঃ শান্তিঃ বলিয়া আমরা আম খাইতে থাকি, এস।

দ্বিতীয়তঃ, গুরুর নিষ্পাপ হওয়া আবশ্যক। অনেক সময়ে লোকে বলিয়া থাকে, "গুরুর চরিত্র, গুরু কি করেন না করেন,

দেখিবার প্রয়োজন কি? তিনি যা বলেন, সেইটি লইয়াই আমাদের কাজ করা আবশ্যক।" এ কথা ঠিক নয়। গতি-বিজ্ঞান রসায়ন বা অন্য কোন পদার্থ-বিজ্ঞান শিখাইতে হইলে শিক্ষক যাহাই হউক না কেন, কিছু আসিয়া যায় না। কারণ উহাতে কেবল বুদ্ধিবৃত্তির চালনা—বুদ্ধিবৃত্তিকে কিঞ্চিৎ সতেজ করারই প্রয়োজন হয়। কিন্তু অধ্যাত্মবিজ্ঞানের আচার্য্য অশুদ্ধচিত্ত হইলে তাঁহাতে আদৌ ধর্ম্মালোক থাকিতে পারে না। অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি আবার ধর্ম্ম কি শিখাইবে? নিজে আধ্যাত্মিক সত্য উপলব্ধি করিবার বা অপরে সঞ্চার করিবার একমাত্র উপায়—হৃদয় ও মনের পবিত্রতা। যতদিন না চিত্তশুদ্ধি হয়, ততদিন ভগবদ্দর্শন বা সেই অতীন্দ্রিয় সত্তার আভাসজ্ঞানও অসম্ভব। সুতরাং ধর্ম্মাচার্য্যের সম্বন্ধে প্রথম তিনি কি চরিত্রের লোক, তাহা দেখা আবশ্যক; তারপর তিনি কি বলেন, তাহা দেখিতে হইবে। তাঁহার সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধচিত্ত হওয়া আবশ্যক; তবেই তাঁহার কথার প্রকৃত একটা গুরুত্ব থাকে; কারণ তাহা হইলেই তিনি প্রকৃত শক্তি-সঞ্চারকের যোগ্য হইতে পারেন। নিজের মধ্যে যদি শক্তি না রহিল, তবে তিনি সঞ্চার করিবেন কি? গুরুর মন এরূপ প্রবল আধ্যাত্মিকস্পন্দন-বিশিষ্ট হওয়া চাই যে, তাহা যেন সমবেদনাবশে শিষ্যে সঞ্চারিত হইয়া যায়। গুরুর বাস্তবিক কার্য্যই এই—কিছু সঞ্চার করা, কেবল শিষ্যের বুদ্ধিশক্তি বা অন্য কোন শক্তি উত্তেজিত করিয়া দেওয়া নহে। বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, গুরু হইতে শিষ্যে যথার্থই একটি শক্তি আসিতেছে। সুতরাং গুরুর শুদ্ধচিত্ত হওয়া আবশ্যক।

তৃতীয়তঃ, গুরুর উদ্দেশ্য কি, দেখা আবশ্যক। গুরু যেন অর্থ, নাম বা যশরূপ কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধর্ম্মশিক্ষাদানে প্রবৃত্ত না হন—সমুদয় মানবজাতির প্রতি পবিত্র প্রেমই যেন তাঁহার কার্য্যের নিয়ামক হয়। আধ্যাত্মিক শক্তি শুদ্ধ প্রেমসূত্রের মধ্য দিয়াই সঞ্চারিত করা যাইতে পারে। কোনরূপ স্বার্থপূর্ণ ভাব, যথা, লাভ বা যশের ইচ্ছা এক মুহূর্ত্তেই এই সূত্রকে ছিন্ন করিয়া ফেলে। ভগবান্ প্রেমস্বরূপ, আর যিনি ভগবান্‌কে প্রেমস্বরূপ বলিয়া জানিয়াছেন, তিনিই মানুষকে শুদ্ধ-সত্ত্ব হইতে ও ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিতে শিক্ষা দিতে পারেন।

যদি দেখ গুরুতে এই সব লক্ষণগুলিই বর্ত্তমান, তবে জানিবে তোমার কোন আশঙ্কা নাই। নতুবা তাঁহার নিকট শিক্ষায় বিপদ আছে ; যেহেতু তিনি যদি হৃদয়ে সাধুভাব সঞ্চার করিতে না পারেন, হয়ত অসাধুভাব সঞ্চার করিবেন। এই বিপদ হইতে আপনাকে সর্ব্বতোভাবে সাবধান রাখিতে হইবে। (“যিনি বিদ্বান্, নিষ্পাপ, কামগন্ধহীন, যিনি শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিৎ”* তিনিই প্রকৃত সদ্‌গুরু।)

যাহা বলা হইল, তাহা হইতে ইহা সহজেই প্রতীত হইবে যে, ধর্ম্মে অনুরাগী হইবার, ধর্ম্মের মর্ম্মবোধ করিবার এবং উহা জীবনে পরিণত করিবার উপযোগী শিক্ষা যাহার তাহার নিকট হইতে পাওয়া যায় না। “পর্ব্বতের নিকট ধর্ম্মোপদেশ-শ্রবণ, কলনাদিনী

---

* শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতো যো ব্রহ্মবিত্তমঃ।

—বিবেকচূড়ামণি, ৩৩ শ্লোক

স্রোতস্বিনীতে গ্রন্থপাঠ ও সকলেই শুভময় দর্শন,"* আলঙ্কারিক বর্ণনাহিসাবে সত্য বটে, কিন্তু যাঁহার নিজের ভিতরে অপরিস্ফুট ভাবেও ধর্ম্মের বীজ নিহিত নাই, কেহই তাঁহাকে এতটুকু তত্ত্বজ্ঞানও দিতে পারে না। পর্ব্বত, নদী আদি কাহাকে শিক্ষা দিতে পারে? যাহার অন্তরের পবিত্র মন্দিরাভ্যন্তরীণ কমল ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেই আত্মাকে। আর যে আলোকে এই কমল সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠে, তাহা ব্রহ্মবিৎ সদ্গুরুরই জ্ঞানালোক। যখন হৃৎপদ্ম এইরূপে ফুটিয়া উঠে, তখন তিনি পর্ব্বত, নদী, তারা, সূর্য্য, চন্দ্র অথবা এই ব্রহ্মময় বিশ্বে যাহা কিছু আছে তাহা হইতেই শিক্ষা পাইতে পারেন। কিন্তু যাঁহার হৃৎপদ্ম এখনও প্রস্ফুটিত হয় নাই, তিনি এ সকল পর্ব্বতাদি ব্যতীত আর কিছু দেখিতে পাইবেন না। অন্ধের চিত্র-শালিকায় গিয়া কি ফল? অগ্রে তাহাকে চক্ষু দাও, তবে সে সেখানকার বস্তুসমূহ হইতে কি শিক্ষা পাওয়া যায়, বুঝিতে পারিবে।

গুরুই ধর্ম্মশিক্ষার্থীর চক্ষু খুলিয়া দেন। সুতরাং কোন ব্যক্তির সহিত তাহার বংশধরের যে সম্বন্ধ, গুরুর সহিত আমাদেরও ঠিক সেই সম্বন্ধ। গুরুর প্রতি বিশ্বাস, বিনয়নম্র আচরণ, তাঁহার আজ্ঞাবহতা ও তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ব্যতিরেকে আমাদের হৃদয়ে ধর্ম্মবিকাশ হইতেই পারিবে না। আর ইহাও বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, যে-সব দেশে গুরুশিষ্যের এতদ্বিধ সম্বন্ধ আছে,

* And this our life exempt from public haunt,
Finds tongues in trees, books in the running brooks,
Sermons in stones and good in every thing.
Shakespeare's 'As you Like It,' Act II, Sc. I

কেবল সেই-সব দেশেই অসাধারণ ধর্ম্মবীর সকল জন্মিয়াছেন; আর যে-সব দেশে গুরুশিষ্যের এ সম্বন্ধ নাই, গুরু কেবল বক্তামাত্র—নিজের প্রাপ্যের দিকেই দৃষ্টি, আর শিষ্য কেবল গুরুর কথাগুলিতেই মাথা পরিপূর্ণ করেন এবং অবশেষে উভয়েই নিজের নিজের পথ দেখেন, সে-সকল স্থলে ধর্ম্মের ঘরে শূন্য বলিলেই হয়। শক্তিসঞ্চার করিবার কেহ নাই, গ্রহণ করিবারও কেহ নাই। ধর্ম্ম এই সব লোকের কাছে যেন ব্যবসায় হইয়া দাঁড়ায়। তারা মনে করে, ইহা অর্থ দ্বারা ক্রয় করিবার জিনিস। ঈশ্বরেচ্ছায় ধর্ম্ম এত সুলভ হইলে বড়ই সুখের বিষয় হইত। তবে দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হইবার নয়।

ধর্ম্ম—সর্ব্বোচ্চ জ্ঞানস্বরূপ যে ধর্ম্ম তাহা ধনবিনিময়ে কিনিবার জিনিস নহে, গ্রন্থ হইতেও ইহা পাওয়া যায় না। জগতের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া আসিতে পার, হিমালয় আল্‌প্‌স্ ককেসস্ প্রভৃতি ঘুটিয়া ফেলিতে পার, সমুদ্রের অতল তল আলোড়ন করিতে পার, তিব্বতের চারিকোণে অথবা গোবি মরুর চতুর্দ্দিকে তন্নতন্ন করিয়া দেখিতে পার, কিন্তু যতদিন না তোমার হৃদয় উহা গ্রহণ করিবার উপযুক্ত হইতেছে এবং যতদিন না তুমি গুরুলাভ করিতেছ, কোথাও উহা খুঁজিয়া পাইবে না। বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট এই গুরু যখনই লাভ করিবে, অমনি বালকবৎ বিশ্বাস ও সরলতায় তাঁহার নিকট প্রাণ খুলিয়া দাও। তাঁহাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরস্বরূপ দেখ। যাহারা এইরূপ প্রেম ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া সত্যানুসন্ধান করে, তাঁহাদের নিকট সত্যের ভগবান্ সত্য, শিব ও সৌন্দর্য্যের অলৌকিক তত্ত্বসমূহ প্রকাশ করেন।

অবতার

যেখানে লোকে তাঁহার নামানুকীর্তন করে, সেই স্থানই পবিত্র। যে ব্যক্তি তাঁহার নামোচ্চারণ করেন, তিনি আরও কত পবিত্র, বিবেচনা কর; সুতরাং যাঁহার নিকট আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রাপ্ত হই, তাঁহার নিকট কতদূর ভক্তির সহিত অগ্রসর হওয়া উচিত। ঐরূপ শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্মাচার্য্যগণের সংখ্যা জগতে খুব বিরল বটে, কিন্তু জগৎ একেবারে এই সকল আচার্য্যবিরহিত নহে। যে মুহূর্ত্তে উহা একেবারে আচার্য্যশূন্য হয়, সেই মুহূর্ত্তেই উহা এক ভয়ানক নরককুণ্ডরূপে পরিণত ও বিনাশের দিকে অগ্রসর হয়। ইঁহারা মানবজীবনোদ্যানের সুচারু পুষ্পস্বরূপ এবং 'অহেতুক-দয়াসিন্ধু'।* শ্রীকৃষ্ণ ভাগবতে বলিয়াছেন, "আমাকে আচার্য্য বলিয়া জানিও।" †

সাধারণ গুরুশ্রেণী হইতে উন্নত আর এক শ্রেণীর গুরু আছেন— ঈশ্বরের অবতারগণ। ইঁহারা স্পর্শ দ্বারা, এমন কি, কেবল মাত্র ইচ্ছা দ্বারাই অপরের ভিতর ভগবদ্ভাব সঞ্চার করিয়া দিতে পারেন। তাঁহাদের ইচ্ছায় অতি দুরাচার ব্যক্তিও মুহূর্ত্তের মধ্যে সাধুরূপে পরিণত হয়। ইঁহারা সকল গুরুরও গুরু, মানুষের ভিতর ভগবানের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। আমরা তাঁহাদের ভিতর দিয়া ব্যতীত

* বিবেকচূড়ামণি, ৩৫ শ্লোক

† আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ—ইত্যাদি।

—শ্রীমদ্ভাগবত, ১১স্কঃ, ১৭অঃ, ২৭ শ্লোক

অন্য উপায়ে ভগবান্‌কে দেখিতে পারি না। আমরা তাঁহাদিগকে উপাসনা না করিয়া থাকিতে পারি না, আর কেবল ইঁহাদিগকেই আমরা উপাসনা করিতে বাধ্য।

এই সকল নররূপধারী ঈশ্বর ব্যতীত ভগবান্‌কে দেখিবার আমাদের আর অন্য কোন উপায় নাই। আমরা যদি আর কোনরূপে তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করি, তবে আমরা একটা কিম্ভূতকিমাকার জীব গঠন করিয়া ফেলি এবং উহাকেই প্রকৃত ঈশ্বর বলিয়া মনে করি। গল্প আছে—এক আনাড়ী শিব গড়িতে অনেক দিন চেষ্টা করিয়া একটি বানর গড়িয়াছিল। সেইরূপ ভগবান্‌কে নির্গুণ পূর্ণস্বরূপে যখনই আমরা ভাবিতে যাই, তখনই সম্পূর্ণ অকৃতকার্য্য হইয়া থাকি; কারণ যতদিন আমরা মানুষ, ততদিন তাঁহাকে মানুষ হইতে উচ্চতর কখনই ভাবিতে পারিব না। অবশ্য এমন সময় আসিবে, যখন আমরা মনুষ্যপ্রকৃতি অতিক্রম করিয়া তাঁহার স্বরূপবোধে সমর্থ হইব, কিন্তু যতদিন মানুষ থাকিব, ততদিন মানুষের ভিতর ও মানুষরূপেই তাঁহাকে উপাসনা করিতে হইবে। যাই বল না কেন, যতই চেষ্টা কর না কেন, ভগবান্‌কে মানুষ ছাড়া আর কিছু ভাবিতে পার না। ঈশ্বরসম্বন্ধে—জগতের সকল বস্তুর সম্বন্ধে খুব যুক্তিতর্কসমন্বিত বক্তৃতা দিতে পার খুব যুক্তিবাদী হইতে পার, আর ভগবানের এই সকল মনুষ্যঅবতারের কথা সব ভ্রমাত্মক, ইহা এমন ভাবে প্রমাণ করিতে পার যাহাতে তোমাদের সম্পূর্ণ তৃপ্তি হয়, কিন্তু সহজ বুদ্ধিতে কি বলে একবার ভাবিয়া দেখ দেখি। এইরূপ অদ্ভুত বিচার-বুদ্ধির দ্বারা কি লব্ধ হয়? কিছুই

নয়—শূন্য, কেবল কতকগুলি বাক্যাড়ম্বর মাত্র। এখন হইতে যদি কোন লোক এইরূপ অবতারপূজার বিরুদ্ধে মহাযুক্তিতর্কের সহিত বক্তৃতা করিতেছেন দেখ, তবে তাঁহার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা কর—ভাই, তোমার ঈশ্বর-ধারণা কি? সর্ব্বশক্তিমত্তা, সর্ব্বব্যাপিতা ও এতদ্বিধ শব্দে কি বোঝায়, তাহা তিনি ঐ শব্দগুলির বানান ব্যতীত আর অধিক কি বোঝেন? এ সকল শব্দের দ্বারা তাঁহার মনে কোন ভাববিশেষেরই উদয় হয় না। তিনি ইহাদের অর্থস্বরূপে এমন কোন ভাব ব্যক্ত করিতে পারেন না, যাহাতে তাঁহার মানবীয় প্রকৃতির কোন সম্পর্ক নাই। এই বিষয়ে রাস্তার যে লোকটা একখানা পুঁথিও পড়ে নাই তাহার সহিত ইঁহার কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। তবে সে লোকটা শান্তপ্রকৃতি, জগতের শান্তিভঙ্গ করে না আর এই লম্বা-চৌড়া-বাক্যব্যয়কারী ব্যক্তি সমাজে অশান্তি ও দুঃখ আনয়ন করে। বাস্তবিক প্রত্যক্ষানুভূতি ব্যতীত ধর্ম্ম ধর্ম্মনামেরই যোগ্য নহে। সুতরাং বৃথা বাক্যব্যয়ে ও প্রত্যক্ষানুভূতির মধ্যে আমাদের বিশেষ প্রভেদ দেখা আবশ্যক। আত্মার গভীরতম প্রদেশে আমরা যাহা অনুভব করি, তাহাকেই প্রত্যক্ষানুভূতি বলে। এই বিষয়ে সহজ জ্ঞান যত দুর্লভ, আর কিছুই তত নহে।

আমাদের বর্ত্তমান প্রকৃতি যেরূপ, তাহাতে আমাদিগকে বাধ্য হইয়াই ভগবান্‌কে মনুষ্যরূপে দেখিতে হইবে। মনে কর মহিষদের ভগবান্‌কে পূজা করিবার ইচ্ছা হইল—তাহাদের স্বভাবানুযায়ী তাহারা ভগবান্‌কে একটি বৃহৎ মহিষ দেখিবে। মৎস্য ভগবানের আরাধনেচ্ছু হইলে তাহাকে তাহার ভগবান্‌কে একটি বৃহৎ মৎস্য ভাবিতে হইবে। মানুষকেও ভগবান্‌কে মানুষ ভাবিতে হইবে। আর

মনে করিও না, ঐ সকল বিভিন্ন ধারণা কল্পনাসম্ভূত মাত্র। মানুষ, মহিষ, মৎস্য এগুলি যেন ভিন্ন ভিন্ন পাত্রস্বরূপ—এগুলিই ভগবৎ-সমুদ্রে নিজেদের জলধারণশক্তি ও আকৃতি অনুসারে পূর্ণ হইয়াছে। মানুষে ঐ জল মানুষের আকার ধারণ করিল, মহিষে মহিষের আকার ও মৎস্যে মৎস্যাকার ধারণ করিল। এই প্রত্যেক পাত্রেই সেই একই ঈশ্বর-সমুদ্রের জল রহিয়াছে। মানুষ তাঁহাকে মানুষরূপে দেখিবে আর তির্য্যগ্‌জাতির যদি ভগবৎসম্বন্ধীয় কোনরূপ জ্ঞান থাকে, তবে তাহারা নিজেদের ধারণানুরূপ পশুরূপে তাঁহাকে ভাবিবে। অতএব আমরা ভগবান্‌কে মানুষরূপে না দেখিয়া থাকিতে পারি না। সুতরাং আমাদের তাঁহাকে মানুষরূপেই উপাসনা করিতে হইবে, অন্য কোন পথ নাই।

দুই প্রকার লোক ভগবান্‌কে মানুষরূপে উপাসনা করে না। প্রথম—নরপশুগণ, যাহাদের কোনরূপ ধর্ম্মজ্ঞান নাই; দ্বিতীয়—পরমহংসগণ, যাঁহারা মনুষ্যসুলভ সমুদয় দৌর্ব্বল্য অতিক্রম করিয়া মানবপ্রকৃতির সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছেন। সমুদয় প্রকৃতিই তাঁহাদের আত্মস্বরূপ হইয়া গিয়াছে। তাঁহারাই কেবল ভগবান্‌কে তাঁহার স্বরূপে উপাসনা করিতে পারেন। অন্য সব বিষয়েও যেমন, এখানেও তেমন দুটি চূড়ান্ত ভাব একরূপ দেখায়। অতিশয় অজ্ঞানী, পরম জ্ঞানী কেহই উপাসনা করে না, নরপশুগণ অজ্ঞান বলিয়া উপাসনা করে না, আর জীবন্মুক্ত পুরুষগণ সর্ব্বদা আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে অনুভব করিতেছেন বলিয়া তাঁহাদের স্বতন্ত্র উপাসনার আর প্রয়োজন হয় না। যে ব্যক্তি এই দুই চূড়ান্তভাবের মধ্যাবস্থায় অবস্থিত, অথচ বলে আমি ভগবান্‌কে

মনুষ্যরূপে উপাসনা করিতে ইচ্ছা করি না, সেই ব্যক্তিকে একটু বিশেষ করিয়া যত্নের সহিত তত্ত্বাবধান করা আবশ্যক। তাহার প্রতি কঠোরতর ভাষা প্রয়োগ না করিলে তাহাকে প্রলাপভাষী বলিতে হয়। তাহার ধর্ম্ম বিকৃতমস্তিষ্ক ও মস্তিষ্কহীনগণেরই উপযুক্ত।

ভগবান্ মানুষের দুর্ব্বলতা বুঝেন আর মানুষের হিতের জন্য মানুষরূপে অবতীর্ণ হন। ("যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি আপনাকে সৃজন করি। সাধুদের রক্ষা, পাপিগণের দুষ্কৃতিনাশ ও ধর্ম্মসংস্থাপন জন্য আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি।"*) "অজ্ঞ ব্যক্তিরা জগতের ঈশ্বর আমার প্রকৃত স্বরূপ না জানিয়া মনুষ্যরূপধারী আমাকে উপহাস করে।" †

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অবতার সম্বন্ধে এই সকল কথা বলিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "যখন প্রবল বন্যা আসে তখন সমুদয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী ও খানা আপনা আপনি কিনারা পর্য্যন্ত পূর্ণ হইয়া যায়। সেইরূপ যখন অবতার আসেন, তখন জগতের ভিতর মহান্ আধ্যাত্মিক তরঙ্গ উত্থিত হয়। সেখানকার হাওয়াতেই যেন ধর্ম্মভাব বহিতে থাকে।"

* যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥
—গীতা, ৪র্থ অধ্যায়, ৭ম । ৮ম শ্লোক

† অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥
—গীতা, ৯ম অধ্যায়, ১১শ শ্লোক

মন্ত্র

কিন্তু এক্ষণে এই মহাপুরুষ—এই অবতারগণের কথা বলিব না; এক্ষণে আমরা সিদ্ধ গুরুদিগের বিষয় আলোচনা করিব। তাঁহাদিগকে সচরাচর মন্ত্র দ্বারা শিষ্যগণের ভিতরে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বীজ বপন করিতে হয়। এই মন্ত্রগুলি কি? ভারতীয় দর্শন মতে সমুদয় জগৎ নামরূপাত্মক। এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ মনুষ্যের চিত্তমধ্যে এমন একটি তরঙ্গ থাকিতে পারে না, যাহা নামরূপাত্মক নয়। যদি ইহা সত্য হয় যে, প্রকৃতি সর্ব্বত্র এক নিয়মে নির্ম্মিত, তাহা হইলে এই নামরূপাত্মকতা সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ম বলিতে হইবে। "যেমন একটি মৃৎপিণ্ডকে জানিলে আর সমস্ত মৃত্তিকাকেও জানিতে পারা যায়।" * তদ্রূপ এই দেহ-পিণ্ডকে জানিতে পারিলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে জানিতে পারা যায়। রূপ যেমন বস্তুর বহিস্ত্বক্‌স্বরূপ আর নাম বা ভাব যেন উহার অন্তর্নিহিত শস্যস্বরূপ। শরীর—রূপ আর মন বা অন্তঃকরণ—নাম, আর বাক্‌শক্তিযুক্ত প্রাণিসমূহে এই নামের সহিত উহাদের বাচকশব্দগুলির এক অভেদ্য যোগ বর্ত্তমান। অথবা মানুষের ভিতরেই ব্যষ্টিমহৎ বা চিত্তে এই চিন্তাতরঙ্গগুলি উত্থিত হইয়া প্রথমে শব্দ, পরে তদপেক্ষা স্থূলতর আকার ধারণ করে।

বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডেও—ব্রহ্মা, হিরণ্যগর্ভ বা সমষ্টিমহৎ প্রথমে আপনাকে নাম, পরে রূপাকারে অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান্ জগদ্রূপে অভিব্যক্ত

---

*, যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ ইত্যাদি।

—ছান্দোগ্য, ৬ষ্ঠ প্র, ১ম খণ্ড, ৪র্থ মন্ত্র

করেন। এই ব্যক্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎই রূপ ; ইহার পশ্চাতে অনন্ত অব্যক্ত স্ফোট রহিয়াছে। স্ফোট অর্থে সমুদয় জগতের অভি-ব্যক্তির কারণ শব্দব্রহ্ম। সমুদয় নাম অর্থাৎ ভাবের নিত্য-সমবায়ী উপাদান-স্বরূপ নিত্য স্ফোটই সেই শক্তি, যদ্দ্বারা ভগবান্ এই জগৎ সৃজন করেন ; শুধু তাহাই নহে, ভগবান্ প্রথমে আপনাকে স্ফোটরূপে পরিণত করিয়া পরে অপেক্ষাকৃত স্থূল এই পরিদৃশ্য-মান্ জগদ্রূপে পরিণত করেন। এই স্ফোটের একমাত্র বাচক শব্দও আছে—ওঁ। আর কোনরূপ বিশ্লেষণবলেই যখন আমরা ভাব হইতে শব্দকে পৃথক করিতে পারি না, তখন এই ওঙ্কার ও নিত্য-স্ফোট মধ্যে নিত্যসম্বন্ধ বর্ত্তমান। সুতরাং অনায়াসে মনে করা যাইতে পারে, সমুদয় নামরূপের জনকস্বরূপ ওঙ্কাররূপ এই পবিত্রতম শব্দ হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। তবে যদি বল যে, শব্দ ও ভাব নিত্যসম্বন্ধ বটে কিন্তু একটি ভাবের বাচক অনন্ত শব্দ থাকিতে পারে, সুতরাং সমুদয় জগতের অভিব্যক্তির কারণ-স্বরূপ ভাবের বাচক যে একটিমাত্র ওঙ্কারই তাহার কোন অর্থ নাই। এ কথা বলিলে আমাদের উত্তর এই, ওঙ্কারই এইরূপ সর্ব্বভাবব্যাপী বাচক শব্দ, আর কোন শব্দ এতত্তুল্য নহে। স্ফোটই সমুদয় ভাবের উপাদান অথচ উহা কোন পূর্ণ বিকশিত ভাব নহে ; অর্থাৎ বিভিন্ন ভাবগুলির মধ্যে পরস্পর যে প্রভেদ তাহা যদি দূর করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে এই স্ফোটই অবশিষ্ট থাকিবে। আর যখন যে কোন বাচক শব্দ দ্বারা অব্যক্ত স্ফোটকে প্রকাশ করিতে হইলে উহা তাহাকে এতদূর বিশিষ্ট করিয়া ফেলে যে তাহাতে আর স্ফোটত্ব থাকে না, তখন যে শব্দ

দ্বারা উহা খুব অল্প পরিমাণে বিশেষভাবাপন্ন হয় আর যাহা যথাসম্ভব উহার স্বরূপ প্রকাশ করে, তাহাই উহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃত বাচক—ওঙ্কার, কেবলমাত্র ওঙ্কারই এইরূপ। কারণ অ, উ, ম—এই তিনটি অক্ষর একত্রে 'অউম্, এইরূপে উচ্চারিত হইলে উহাই সর্ব্বপ্রকার শব্দের সাধারণ বাচক হইতে পারে। 'অ' সমুদয় শব্দের ভিতরে সর্ব্বাপেক্ষা অল্পবিশেষভাবাপন্ন। এই কারণেই শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়া গিয়াছেন, "আমি অক্ষরের মধ্যে অকার।"* আর সমুদয় স্পষ্টোচ্চারিত শব্দই মুখগহ্বরের মধ্যে জিহ্বামূল হইতে আরম্ভ করিয়া ওষ্ঠ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়া উচ্চারিত হয়। 'অ' কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত, 'ম' শেষ ওষ্ঠ শব্দ। আর 'উ' জিহ্বামূল হইতে যে শক্তি আরম্ভ হইয়া ওষ্ঠে শেষ হয়, সেই শক্তিটি যেন গড়াইয়া যাইতেছে, এই ভাব প্রকাশ করে। প্রকৃতরূপে উচ্চারিত হইলে এই ওঙ্কার সমুদয় শব্দোচ্চারণ ব্যাপারটির সূচক; আর কোন শব্দেরই সেই শক্তি নাই; সুতরাং উহাই স্ফোটের ঠিক উপযোগী বাচক, আর এই স্ফোটই ওঙ্কারের প্রকৃত বাচ্য। আর বাচক বাচ্য হইতে পৃথক্‌কৃত হইতে পারে না, সুতরাং এই ওঁ ও স্ফোট একই পদার্থ। আর যেহেতু এই স্ফোট ব্যক্ত জগতের সূক্ষ্মতমাংশ বলিয়া ঈশ্বরের খুব নিকটবর্ত্তী এবং ঈশ্বরীয় জ্ঞানের প্রথম প্রকাশ, সেই হেতু ওঙ্কারই ঈশ্বরের প্রকৃত বাচক। আর সেই একমাত্র অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে যেমন অপূর্ণ জীবাত্মাগণ বিশেষ বিশেষ ভাবে ও বিশেষ বিশেষ গুণযুক্তরূপে চিন্তা করিতে পারে, সেইরূপ

* অক্ষরাণামকারোঽস্মি।

—গীতা, ১০ম অধ্যায়, ৩৩ শ্লোক

তাঁহার দেহরূপ এই জগৎ ও সাধকের মনোভাবানুযায়ী ভিন্নরূপে চিন্তা করিতে হইবে।

উপাসকের মনে যখন যে তত্ত্ব প্রবল থাকে, তখন তাহার সেই ভাবই উদিত হয়। ইহার ফল এই, একই ব্রহ্ম ভিন্ন ভিন্ন রূপে ভিন্ন ভিন্ন গুণপ্রাধান্যে দৃষ্ট হইবেন, আর সেই এক জগৎই ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হইবে। সর্ব্বাপেক্ষা অল্প বিশেষভাবাপন্ন সার্ব্বভৌম বাচক ওঙ্কারে যেমন বাচ্য ও বাচক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, তদ্রূপ এই বাচ্য-বাচকের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ ভগবানের ও জগতের বিশেষ বিশেষ খণ্ড ভাব সম্বন্ধেও খাটিবে। আর ইহার সকলগুলিরই বিশেষ বিশেষ বাচক শব্দ থাকা আবশ্যক। মহাপুরুষদের গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতি হইতে উত্থিত এই বাচক শব্দসমূহ যথাসম্ভব ভগবান্ ও জগতের এই বিশেষ বিশেষ খণ্ড ভাবের প্রকাশ করে, যেমন ওঙ্কার অখণ্ড ব্রহ্মবাচক, অন্যান্য মন্ত্রগুলিও সেই পরমপুরুষের খণ্ড ভাবগুলির বাচক। ঐ সকলগুলিই ভগবদ্ধ্যান ও প্রকৃত জ্ঞানলাভের সহায়।

প্রতীক ও প্রতিমা-উপাসনা

এইবার প্রতীকোপাসনা ও প্রতিমাপূজার বিষয়ে সমালোচনার সময় আসিল। প্রতীক অর্থে যে-সকল বস্তু অল্প-বিস্তর ব্রহ্মের পরিবর্তে উপাসনার যোগ্য। প্রতীকে ভগবদুপাসনার অর্থ কি? ভগবান্ রামানুজ বলিয়াছেন, "ব্রহ্ম নয় এমন বস্তুতে ব্রহ্মবুদ্ধি করিয়া ব্রহ্মের অনুসন্ধানকে প্রতীকোপাসনা বলে।"* শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন, " 'মনকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিবে, ইহা আধ্যাত্মিক,' 'আকাশ ব্রহ্ম ইহা আধিদৈবিক'। (মন আধ্যাত্মিক ও আকাশ বাহ্য প্রতীক—এই উভয়কেই ব্রহ্মের বিনিময়ে উপাসনা করিতে হইবে।) 'এইরূপ, আদিত্যই ব্রহ্ম, ইহাই আদেশ'... 'যিনি নামকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন' ইত্যাদি স্থলে প্রতীকোপাসনা সম্বন্ধে সংশয় হয়।"† প্রতীক শব্দের অর্থ—বাহিরের দিকে যাওয়া, আর প্রতীকোপাসনা-অর্থে ব্রহ্মের পরিবর্তে এমন এক বস্তুর উপাসনা, যাহা একাংশে অথবা অনেকাংশে ব্রহ্মের খুব সন্নিহিত, কিন্তু ব্রহ্ম নহে। শ্রুতিতে বর্ণিত প্রতীকের ন্যায়

* অব্রহ্মণি ব্রহ্মদৃষ্ট্যাঽনুসন্ধানম্।

—ব্রহ্মসূত্র, ৪র্থ অধ্যায়, ১ম পাদ, ৫ম সূত্রের রামানুজভাষ্য

† মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীতেত্যধ্যাত্মম্। অথাধিদৈবতমাকাশো ব্রহ্মেতি। তথা আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশঃ। স যো নামব্রহ্মেত্যুপাস্তে ইত্যেবমাদিষু প্রতীকোপাসনেষু সংশয়ঃ।

—ব্রহ্মসূত্র, ৪র্থ অধ্যায়, ১ম পাদ, ৪র্থ সূত্রের শাঙ্করভাষ্য

পুরাণ তন্ত্রেও অনেক প্রতীকের বর্ণনা আছে। সমুদয় পিতৃ-উপাসনা ও দেবোপাসনা এই প্রতীকোপাসনার অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে।

এক্ষণে কথা এই, ঈশ্বরকে এবং কেবল ঈশ্বরকে উপাসনার নামই ভক্তি। দেব, পিতৃ অথবা অন্য কোন উপাসনা ভক্তিশব্দবাচ্য হইতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ; উহা উপাসককে কেবল কোন প্রকার স্বর্গভোগরূপ বিশেষ ফল প্রদান করে, কিন্তু উহাতে ভক্তির উদয় হয় না—উহা মুক্তিও প্রসব করিতে পারে না। সুতরাং একটি কথা বিশেষরূপে মনে রাখা আবশ্যক, দার্শনিক দৃষ্টিতে পরমব্রহ্ম হইতে জগৎকারণের উচ্চতম ধারণা আর হইতে পারে না; প্রতীকোপাসক কিন্তু অনেক স্থলে এই প্রতীককে ব্রহ্মের আসনে বসাইয়া উহাকে আপন আত্মস্বরূপ চিন্তা করিতে পারেন। কিন্তু এরূপ স্থলে সেই উপাসককে সম্পূর্ণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে হয়, কারণ প্রকৃত প্রস্তাবে কোন প্রতীকই উপাসকের আত্মা হইতে পারে না। কিন্তু যেখানে ব্রহ্মই উপাস্য, আর প্রতীক কেবল উহার প্রতিনিধিস্বরূপ অথবা উহার উদ্দীপক কারণমাত্র, অর্থাৎ যেখানে প্রতীকের সহায়তায় সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মের উপাসনা করা হয়, প্রতীককে প্রতীকমাত্র না দেখিয়া জগৎকারণ-রূপে চিন্তা করা হয়, সেখানে এইরূপ উপাসনা বিশেষ উপকারী। শুধু তাহাই নহে, প্রবর্ত্তকদিগের পক্ষে উহা একেবারে অনিবার্য্য-রূপে প্রয়োজনীয়। সুতরাং যখন কোন দেবতা অথবা অন্য প্রাণীকে ঐ দেবতা অথবা প্রাণিরূপেই উপাসনা করা হয়, তখন এরূপ উপাসনাকে একটি ধর্ম্মমাত্র বলা যাইতে পারে। আর উহা একটি

বিদ্যা বলিয়া উপাসক ঐ বিশেষ বিদ্যার ফল লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু যখন কোন দেবতা অথবা অন্য প্রাণী ব্রহ্মরূপে দৃষ্ট ও উপাসিত হন, তখন উহা ঈশ্বরোপাসনার সহিত তুল্যফল হইয়া পড়ে। ইহা হইতেই বুঝা যায়, অনেক স্থলে শ্রুতি, স্মৃতি সর্ব্বত্রই কোন দেবতা বা মহাপুরুষ অথবা অন্য কোন অলৌকিক পুরুষের দেবত্ব প্রভৃতি ভুলিয়া গিয়া তাঁহাদিগকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করা হয় কেন। অদ্বৈতবাদী বলেন, "নামরূপ বাদ দিলে সকল বস্তুই কি ব্রহ্ম নহে?" বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বলেন, "সেই প্রভুই কি সকলের অন্তরাত্মা নহেন?" শঙ্কর তাঁহার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে বলিয়াছেন, "আদিত্যাদির উপাসনার ফল ব্রহ্মই দেন, কারণ তিনি সকলের অধ্যক্ষ। যেমন প্রতিমাদিতে বিষ্ণু আদি দৃষ্টি আরোপ করিতে হয়, তদ্রূপ প্রতীকেও ব্রহ্মদৃষ্টি আরোপ করিতে হয়, সুতরাং এখানে প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মেরই উপাসনা করা হইতেছে বুঝিতে হইবে।"*

প্রতীক সম্বন্ধে যে-সকল কথা বলা হইল, প্রতিমা সম্বন্ধেও সেই-সকল কথা খাটিবে, অর্থাৎ যদি প্রতিমা কোন দেবতা বা সাধুর সূচক হয়, তাহা হইলে সেইরূপ উপাসনাকে ভক্তি বলা যাইবে না, সুতরাং উহা হইতেও মুক্তিলাভ হইবে না। কিন্তু উহা সেই এক ঈশ্বরের সূচক হইলে উহার উপাসনায় ভক্তি মুক্তি উভয়ই লাভ হয়। জগতের প্রধান প্রধান ধর্ম্মগুলির মধ্যে

* আদিত্যাদ্যুপাসনেঽপি ব্রহ্মৈব দাস্যতি সর্ব্বাধ্যক্ষত্বাৎ। ... ঈদৃশংচাত্র ব্রহ্মণ উপাস্যত্বং যৎ প্রতীকেষু তদ্দৃষ্ট্যধ্যারোপণং প্রতিমাদিষু ইব বিষ্ণ্বাদীনাম্।

—ব্রহ্মসূত্র, ৪র্থ অধ্যায়, ১ম পাদ, ৫ম সূত্রের শাঙ্করভাষ্য

বেদান্ত, বৌদ্ধধর্ম্ম ও খৃষ্টধর্ম্মের কোন কোন সম্প্রদায়ের প্রতিমা-পূজা সম্বন্ধে কিছুমাত্র আপত্তি নাই; বরং তাঁহারা অবাধে প্রতিমার সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন; কেবল মুসলমান ও প্রোটেষ্ট্যান্ট ধর্ম্ম এই সহায়তার আবশ্যকতা স্বীকার করেন না। তাহা হইলেও মুসলমানেরা তাঁহাদের সাধু ও ধর্ম্মার্থে প্রাণোৎসর্গী ব্যক্তিগণের কবর একরূপ প্রতিমাস্থলেই ব্যবহার করিয়া থাকেন। প্রোটেষ্ট্যান্টরা ধর্ম্মে বাহ্য সহায়তার আবশ্যকতা উড়াইয়া দিতে গিয়া প্রতিদিন ক্রমশঃ উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছেন। আর আজকাল খাঁটি প্রোটেষ্টাণ্টের সহিত, কেবল নীতিমাত্রবাদী অগষ্ট কম্‌তের চেলা ও অজ্ঞেয়বাদীদের কোন প্রভেদ নাই। আর খৃষ্ট বা মুসলমান ধর্ম্মে প্রতিমাপূজার যেটুকু অবশিষ্ট আছে, সেটুকু কেবল তাহাই যাহাতে প্রতীক বা প্রতিমামাত্রই উপাসিত হয়, ব্রহ্মদৃষ্টিসৌকার্য্যার্থে নহে। সুতরাং উহা জোর কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত মাত্র। অতএব উহা হইতে মুক্তি বা ভক্তি কিছুমাত্র লাভ হইতে পারে না। এইরূপ প্রতিমাপূজাতে আত্মা ঈশ্বর ভিন্ন অন্য বস্তুতে আত্মসমর্পণ করেন, সুতরাং প্রতিমা, কবর, মন্দির ইত্যাদির এইরূপ ব্যবহারকেই প্রকৃত পুতুলপূজা বলা যায়। কিন্তু তাহা হইলেও উহা কোন পাপকর্ম্ম নহে বা অন্যায় নহে। উহা একটি কর্ম্মমাত্র—উপাসকেরা উহার ফলও অবশ্যই পাইয়া থাকেন।

ইষ্টনিষ্ঠা

এইবার ইষ্টনিষ্ঠা সম্বন্ধে আমাদিগকে আলোচনা করিতে হইবে। যে ভক্ত হইতে চাহে, তাহার জানা উচিত 'যত মত তত পথ'— তাহার জানা উচিত বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় সেই একই ভগবানের মহিমার বিভিন্ন বিকাশমাত্র। "লোকে তোমাকে কত বিভিন্ন নামে ডাকিয়া থাকে—লোকে তোমাকে বিভিন্ন নামে যেন ভাগ করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু ঐ প্রত্যেক নামেই যেন তোমার পূর্ণশক্তি বর্ত্তমান। যে উপাসক যে ভাবে উপাসনা করিতে ভালবাসে, তাহার নিকট তুমি সেই নামের ভিতর দিয়াই প্রকাশিত হও। তোমার প্রতি আত্মার ঐকান্তিক অনুরাগ থাকিলে তোমাকে ডাকিবারও কোন নির্দ্দিষ্ট কাল নাই। তোমার নিকট এত সহজে যাওয়া যায়, কিন্তু আমার দুর্দ্দৈব তোমার প্রতি অনুরাগ জন্মিল না।"* শুধু ইহাই নহে, ভক্তগণের উচিত তাঁহারা যেন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা মহাতেজস্বী জ্যোতির তনয়গণকে ঘৃণা না করেন; এমন কি, তাঁহাদের দোষদৃষ্টিবিষয়েও বিশেষ সতর্ক থাকেন; তাঁহাদের দোষোদ্‌ঘোষণ উহাদের শুনা পর্য্যন্ত

* নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥
—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

৪

উচিত নয়। অবশ্য এমন লোক অতি অল্পই আছেন যাঁহারা একেবারে মহা উদারতাসম্পন্ন ও অপরের গুণনিরীক্ষণে সমর্থ অথচ গভীরপ্রেমসম্পন্ন। সচরাচর দেখা যায়, উদারভাবাপন্ন সম্প্রদায়সকল প্রেমের গভীরতা হারাইয়া ফেলে। তাহাদের নিকট ধর্ম্ম একরূপ রাজনৈতিক ও সামাজিক উভয়ভাবাপন্ন কোন সমিতির সভ্যগণের কর্ত্তব্যের মত দাঁড়ায়। আবার খুব সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকগণ নিজেদের ইষ্টের প্রতি খুব ভক্তিসম্পন্ন বটে কিন্তু তাহাদের এই ভক্তি অপর সকল সম্প্রদায়ের (যাহাদের মতের সহিত তাহাদের এতটুকুও পার্থক্য আছে) উপর ঘৃণারূপ ভিত্তির উপর স্থাপিত। ঈশ্বরেচ্ছায় জগৎ পরম উদার অথচ গভীরপ্রেমসম্পন্ন জনগণে পূর্ণ হইয়া গেলে বড় ভাল হইত! কিন্তু এরূপ মহাত্মার সংখ্যা অতি অল্প এবং তাঁহারাও কালেভদ্রে জন্মগ্রহণ করেন। তথাপি আমরা জানি, জগতের অনেক লোককে এইরূপ গভীরতা ও উদারতার অপূর্ব্ব সম্মিলনরূপ আদর্শে শিক্ষিত করা সম্ভব। আর ইহার উপায় এই ইষ্টনিষ্ঠা। সকল ধর্ম্মের সকল সম্প্রদায় মানুষকে কেবল একটিমাত্র আদর্শ দেখাইয়া দেয়। কিন্তু সনাতন বৈদান্তিক ধর্ম্ম ভগবানের সেই মন্দিরের অভ্যন্তরদেশে প্রবেশ করিবার অনন্ত দ্বার খুলিয়া দিয়াছেন এবং মানবের সমক্ষে একরূপ অগণ্য আদর্শরাশি স্থাপন করিয়াছেন। সেই আদর্শগুলির প্রত্যেকটিই সেই অনন্তস্বরূপের এক-একটি বিকাশমাত্র। পরমকরুণাপরবশ হইয়া বেদান্ত মুমুক্ষু নরনারীগণকে অতীত ও বর্ত্তমানে মহিমান্বিত ঈশ্বরতনয় বা ঈশ্বরের মানবীয় অবতারগণের দ্বারা মনুষ্যজীবনের বাস্তবঘটনাবলীরূপ কঠিন পর্ব্বত কাটিয়া বিভিন্ন পথ

দেখাইয়া দিতেছেন আর বাহু প্রসারিত করিয়া সকলকে, এমন কি পরবংশীয়গণকে পর্য্যন্ত সেই সত্যের গৃহ ও আনন্দের সমুদ্রে আহ্বান করিতেছেন, যেখানে মানবাত্মা মায়াজাল হইতে মুক্ত হইয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও অনন্ত আনন্দে মাতোয়ারা হইতে পারে।

অতএব ভক্তিযোগ ভগবৎপ্রাপ্তির বিভিন্ন পথগুলির কোনটিকে ঘৃণা বা অস্বীকার করিতে একেবারে নিষেধ করেন। তথাপি যত দিন গাছ ছোট থাকে, ততদিন বেড়া দিয়া রাখিতে হয়। অপক্ক অবস্থায় একেবারে নানাপ্রকার ভাব ও আদর্শ সম্মুখে রাখিলে ধর্ম্মরূপ কোমল লতিকা মরিয়া যাইবে। অনেক লোকে ধর্ম্মে উদার ভাবের নামে অনবরত ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া আপনাদের বৃথা কৌতূহল মাত্র চরিতার্থ করে। তাহাদের নিকট নূতন নূতন বিষয় শুনা যেন একরূপ ব্যারাম, একরূপ নেশার ঝোঁকের মত দাঁড়ায়। তাহারা খানিকটা সাময়িক স্নায়বীয় উত্তেজনা চায়, সেটি চলিয়া গেলেই তাহারা আর একটির জন্য প্রস্তুত হয়। ধর্ম্ম তাহাদের নিকট যেন আফিমের নেশার মত হইয়া দাঁড়ায় আর ঐ পর্য্যন্তই তাহাদের দৌড়। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন—"সমুদ্রে এক রকম ঝিনুক আছে, তারা সদাসর্ব্বদা হাঁ কোরে জলের ওপর ভাসে, কিন্তু স্বাতি-নক্ষত্রের এক ফোঁটা জল মুখে পড়্‌লে তারা মুখ বন্ধ করে একেবারে জলের নীচে চলে যায়, আর ওপরে আসে না। তত্ত্বপিপাসু বিশ্বাসী সাধক ও সেই রকম গুরুমন্ত্ররূপ এক ফোঁটা জল পেয়ে সাধনার অগাধ জলে একেবারে ডুবে যায়, আর অন্য দিকে চেয়ে দেখে না।"

এই উদাহরণে ইষ্টনিষ্ঠা-ভাবটি যেরূপ হৃদয়স্পর্শী কবিত্বের ভাষায় প্রস্ফুটিত হইয়াছে, আর কোথাও তদ্রূপ হয় নাই।

প্রবর্ত্তকের এই একনিষ্ঠা না থাকিলে চলিবে না। হনুমানের ন্যায় তাঁহার জানা উচিত, "যদিও লক্ষ্মীপতি ও সীতাপতি পরমাত্মা-রূপে অভেদ, তথাপি কমললোচন রামই আমার সর্ব্বস্ব।"* অথবা সাধু তুলসীদাস যেমন বলিতেন, "সকলের সঙ্গে বস, সকলের সঙ্গে আনন্দ কর, সকলের নাম গ্রহণ কর, যে যাহাই বলুক না কেন সকলকে হাঁ, হাঁ বল, কিন্তু নিজের ভাব দৃঢ় রাখিও।" † তাঁহারও সেই আচার অবলম্বন করা উচিত। তাহা হইলেই যদি ভক্তসাধক অকপট হন, তবে গুরুদত্ত ঐ বীজমন্ত্রের প্রভাবেই পরাভক্তি ও পরমজ্ঞানরূপ সুবৃহৎ বটবিটপী উৎপন্ন হইয়া শাখার পর শাখা ও মূলের পর মূল বিস্তার করিয়া ধর্ম্মরূপ সুবৃহৎ ক্ষেত্রকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদন করিবে। তখনই প্রকৃত ভক্ত দেখিবেন—তাঁহার নিজেরই ইষ্টদেবতা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভিন্ন নামে বিভিন্নরূপে উপাসিত।

* শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ॥

† সব্‌সে বসিয়ে সব্‌সে রসিয়ে সব্‌কা লিজিয়ে নাম।
হাঁজি হাঁজি করতে রহিয়ে বৈঠিয়ে আপনা ঠাম॥
—তুলসীদাসজীকৃত দোঁহা

ভক্তির সাধন

ভক্তিলাভের উপায় ও সাধনসম্বন্ধে ভগবান্ রামানুজ তাঁহার বেদান্তভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

"বিবেক, বিমোক, অভ্যাস, ক্রিয়া, কল্যাণ, অনবসাদ ও অনুদ্ধর্ষ হইতে ভক্তিলাভ হয়।" বিবেক অর্থে রামানুজের মতে খাদ্যাখাদ্যবিচার। তাঁহার মতে খাদ্যদ্রব্যের অশুদ্ধির কারণ তিনটি: (১) জাতিদোষ অর্থাৎ খাদ্যের প্রকৃতিগত দোষ, যথা—রশুন, পেঁয়াজ প্রভৃতি স্বভাবতঃ অশুচি খাদ্যের যে দোষ; (২) আশ্রয়দোষ অর্থাৎ পতিত ও অভিশপ্ত ব্যক্তির হস্তে খাইলে যে দোষ; (৩) নিমিত্তদোষ অর্থাৎ কোন অশুচি বস্তুর, যথা—কেশ, ধূলি আদি সংস্পর্শজনিত দোষ। শ্রুতি বলিলেন, শুদ্ধ আহার করিলে চিত্ত শুদ্ধ হয়, চিত্ত শুদ্ধ হইলে ভগবান্কে সর্ব্বদা স্মরণ করিতে পারা যায়।* রামানুজ ছান্দোগ্য উপনিষদ্ হইতে এই বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন।

এই খাদ্যাখাদ্যবিচার ভক্তিমার্গাবলম্বিগণের মতে চিরকালই একটি গুরুতর বিষয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। অনেক ভক্তসম্প্রদায় এ বিষয়টিকে অনেক অস্বাভাবিক করিয়া তুলিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে একটি গুরুতর সত্য অন্তর্নিহিত আছে। আমাদের মনে রাখা উচিত, সাংখ্যদর্শনের মতে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ যাহাদের সাম্যাবস্থা সেই প্রকৃতি এবং যাহারা বৈষম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া

---

* আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ।

—ছান্দোগ্য উপনিষৎ, ৭ম প্রঃ, ২৬শ খণ্ড

জগদ্রূপে পরিণত হয় তাহারা প্রকৃতির গুণ ও উপাদান উভয়ই; সুতরাং ঐ সকল উপাদানেই সমুদয় নরদেহ নির্ম্মিত। উহাদের মধ্যে সত্ত্বপদার্থের প্রাধান্যই আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে অত্যাবশ্যক। আমরা আহারের দ্বারা শরীরের ভিতর যে উপাদান গ্রহণ করি, তাহাতে আমাদের মানসিক গঠনের অনেক সাহায্য হয়, সুতরাং আমাদিগকে খাদ্যাখাদ্যবিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এ বিষয়েও শিষ্যেরা চিরকাল যেরূপ গোঁড়ামি করিয়া থাকে, তাহা যেন আচার্য্যগণের স্কন্ধে আরোপিত না হয়।

বাস্তবিক খাদ্যের শুদ্ধি-অশুদ্ধিবিচার গৌণমাত্র। পূর্ব্বোদ্ধৃত ঐ বাক্যটিই শঙ্কর তাঁহার উপনিষদ্‌ভাষ্যে অন্যরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঐ বাক্যস্থ 'আহার' শব্দটি যাহা সচরাচর খাদ্য অর্থে গৃহীত হইয়া থাকে, তাহা তিনি অন্য অর্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে "যাহা আহৃত হয়, তাহাই আহার। শব্দাদি বিষয়ের জ্ঞান ভোক্তা অর্থাৎ আত্মার উপভোগের জন্য ভিতরে আহৃত হয়। এই বিষয়ানুভূতিরূপ জ্ঞানের শুদ্ধিকে আহারশুদ্ধি বলে। সুতরাং আহারশুদ্ধি অর্থে আসক্তি, দ্বেষ বা মোহশূন্য হইয়া বিষয়বিজ্ঞান। সুতরাং এইরূপ জ্ঞান বা 'আহার' শুদ্ধ হইলে এইরূপ ব্যক্তির সত্ত্ব অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয় শুদ্ধ হইয়া যাইবে। সত্ত্বশুদ্ধি হইলে অনন্ত পুরুষের যথার্থ স্বরূপজ্ঞান ও অবিচ্ছিন্ন স্মৃতি আসিবে।"*

* আহ্রিয়তে ইত্যাহারঃ শব্দাদিবিষয়জ্ঞানম্ ভোক্তুর্ভোগায়াহ্রিয়তে। তস্য বিষয়োপলব্ধিলক্ষণস্য বিজ্ঞানস্য শুদ্ধিরাহারশুদ্ধিঃ, রাগদ্বেষমোহদোষৈরসংসৃষ্টং বিষয়বিজ্ঞানমিত্যর্থঃ। তস্যামাহারশুদ্ধৌ সত্যাং তদ্বতোঽন্তঃকরণস্য সত্ত্বস্য

এ দুটি ব্যাখ্যা আপাতবিরোধী বলিয়া বোধ হইলেও উভয়টিই সত্য ও প্রয়োজনীয়। সূক্ষ্ম শরীর বা মনের সংযম মাংসপিণ্ডময় স্থূল শরীরের সংযম হইতে উচ্চতর কার্য্য বটে, কিন্তু সূক্ষ্মের সংযম করিতে হইলে অগ্রে স্থূলের সংযম করা বিশেষ আবশ্যক। অতএব প্রবর্ত্তকের পক্ষে তাঁহার গুরু-পরম্পরায় আহার সম্বন্ধে যে-সকল নিয়ম প্রচলিত আছে, সেইগুলি পালন করা আবশ্যক। কিন্তু আজকাল আমাদের অনেক সম্প্রদায়ে এই আহারাদির বিচারের এত বাড়াবাড়ি, এত অর্থহীন নিয়মে বাঁধাবাঁধি, এ বিষয়ে এত গোঁড়ামি যে, তাঁহারা যেন ধর্ম্মটিকে রান্নাঘরের ভিতর পুরিয়াছেন। কখন যে সেই ধর্ম্মের মহান্ সত্যসমূহ তথা হইতে বাহিরে আসিয়া আধ্যাত্মিকতার সূর্য্যালোকে উদ্ভাসিত হইবে, তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। এইরূপ ধর্ম্ম এক বিশেষ প্রকার খাঁটি জড়বাদ মাত্র। উহা জ্ঞান নহে, ভক্তিও নহে, কর্ম্মও নহে। উহা এক বিশেষ প্রকার পাগ্‌লামি মাত্র। যাহারা এই খাদ্যাখাদ্যের বিচারকেই জীবনের সার কার্য্য স্থির করিয়াছে, তাহাদের ব্রহ্মলোকে গতি না হইয়া বাতুলালয়েই গতি অধিক সম্ভব। সুতরাং ইহা যুক্তিসিদ্ধ বোধ হইতেছে যে, খাদ্যাখাদ্যের বিচার মনের স্থিরতারূপ উচ্চাবস্থালাভের জন্য বিশেষ আবশ্যক। নতুবা সহজে এই স্থিরতা লাভ করা যায় না।

তারপর 'বিমোক'। বিমোক অর্থে ইন্দ্রিয়গুলির বিষয়াভিমুখী

শুদ্ধিনৈর্ম্মল্যং ভবতি; সত্ত্বশুদ্ধৌ চ সত্যাং যথাবগতে ভূমাত্মনি ধ্রুবাবিচ্ছিন্না স্মৃতিরবিস্মরণং ভবতি।

—ছান্দোগ্য উপনিষৎ, ৭ম প্রপাঠক, ২৬ খণ্ডের শাঙ্করভাষ্য

গতি নিবারণ ও উহাদিগকে সংযম করিয়া নিজ ইচ্ছার অধীনে আনয়ন এবং ইহা সকল ধর্ম্মসাধনেরই ভিত্তিস্বরূপ।

তারপর 'অভ্যাস' অর্থাৎ আত্মসংযম ও আত্মত্যাগের অভ্যাস। পরমাত্মাকে আমরা আত্মার মধ্যে কত বিচিত্ররূপে অনুভব ও কত গভীরভাবে সম্ভোগ করিতে পারি, তাহার কি ইয়ত্তা আছে? কিন্তু সাধকের প্রাণপণ চেষ্টা ও প্রবল সংযমের অভ্যাস ব্যতীত কখনই তাহা কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে না। "মন যেন সর্ব্বদাই সেই ঈশ্বরের চিন্তায় নিবিষ্ট থাকে।" প্রথম প্রথম ইহা অতি কঠিন বোধ হয়। কিন্তু অধ্যবসায়-সহকারে চেষ্টা করিতে করিতে এই চিন্তার শক্তি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন, "হে কৌন্তেয়, অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা ইহা লব্ধ হইয়া থাকে।"*

তারপর 'ক্রিয়া' অর্থাৎ যজ্ঞ। পঞ্চ মহাযজ্ঞের নিয়মিতরূপ অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

'কল্যাণ' অর্থে পবিত্রতা, আর এই পবিত্রতারূপ একমাত্র ভিত্তির উপর ভক্তিপ্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত। বাহ্যশৌচ অথবা খাদ্যাখাদ্য-সম্বন্ধে বিচার এ উভয়ই সহজ কিন্তু অন্তঃশুদ্ধি ব্যতিরেকে উহাদের কোন মূল্য নাই। রামানুজ অন্তঃশুদ্ধিলাভের উপায়স্বরূপ নিম্নলিখিত গুণগুলির কথা বর্ণনা করিয়াছেন: (১) সত্য, (২) আর্জ্জব—সরলতা, (৩) দয়া—নিঃস্বার্থ পরোপকার, (৪) দান, (৫) অহিংসা—কায়মনোবাক্যে অপরের হিংসা না করা, (৬) অনভিধ্যা—

* অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে।

—গীতা, ৬ অঃ, ৩৫ শ্লোক

পরদ্রব্যে লোভ, বৃথা চিন্তা ও পরকৃত অনিষ্টাচরণের ক্রমাগত চিন্তা-পরিত্যাগ। এই তালিকার মধ্যে অহিংসা গুণটির সম্বন্ধে দুই-চারিটি কথা বলা আবশ্যক। সকল প্রাণিসম্বন্ধেই এই অহিংসাভাব অবলম্বন করিতে হইবে। কেহ কেহ যেমন মনে করেন, মনুষ্যজাতির প্রতি অহিংসাভাব পোষণ করিলেই যথেষ্ট, অন্যান্য প্রাণিগণকে হিংসা করিলে কোন ক্ষতি নাই, অহিংসা বাস্তবিক তাহা নহে। আবার কেহ কেহ যেমন কুকুর-বিড়ালকে লালনপালন করেন বা পিপীলিকাকে চিনি খাওয়ান, কিন্তু নিজ ভ্রাতার গলা কাটিতে দ্বিধা বোধ করেন না, অহিংসা বলিতে তাহাও বুঝায় না। ইহা একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, জগতে যত মহৎ মহৎ ভাব আছে, সেইগুলি যদি দেশকালপাত্রবিচারশূন্য হইয়া অন্ধভাবে অনুষ্ঠান করা যায়, তবে সেইগুলি স্পষ্ট দোষ হইয়া দাঁড়ায়। কতকগুলি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অপরিষ্কার সন্ন্যাসীরা, পাছে তাহাদের গায়ের পোকা মরিয়া যায়, এই ভয়ে স্নান করে না, কিন্তু তজ্জন্য তাহাদের মনুষ্য-ভ্রাতাগণকে যে যথেষ্ট অস্বস্তি ও অসুখ ভোগ করিতে হয়, সে দিকে তাহাদের মোটেই দৃষ্টি নাই। তবে ইহারা বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বী নহে।

যদি দেখা যায়, কোন লোকের ভিতর ঈর্ষার ভাব মোটেই নাই, তবেই বুঝিতে হইবে তাঁহার ভিতর অহিংসাভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যে-কোন ব্যক্তি সাময়িক উত্তেজনায় অথবা কোনরূপ কুসংস্কার বা পুরোহিতকুলের প্রেরণায় কোন সৎকর্ম্ম করিতে অথবা কোনরূপ দান করিতে পারে, কিন্তু তিনিই যথার্থ লোকপ্রেমিক, যিনি কাহারও প্রতি ঈর্ষার ভাব পোষণ না করেন। জগতে যাঁহাদিগকে সচরাচর বড়লোক বলিয়া থাকে, তাঁহারা সামান্য নাম

যশ বা দু-এক টুক্‌রা স্বর্ণখণ্ডের জন্য পরস্পরের প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া থাকেন। যতদিন অন্তরে এই ঈর্ষাভাব থাকে, ততদিন অহিংসাসিদ্ধি বহুদূর। গোজাতি নিরামিষভোজী, মেষও তাহাই; তবে কি তাহারা পরমযোগী, তবে কি তাহারা পরম অহিংসক? যে-কোন মূর্খ ইচ্ছামত কোন বিশেষ খাদ্য বর্জ্জন করিতে পারে। উদ্ভিদ্‌ভোজী জন্তুগণ যেমন কেবল উদ্ভিদ্‌ভোজন জন্য বিশেষ উন্নত পদবীতে আরূঢ় নহে, ইহারাও তদ্রূপ ঐরূপ খাদ্যবিশেষত্যাগগুণেই জ্ঞানী হইয়া যান না। যে ব্যক্তি নির্দ্দয়ভাবে বিধবা ও অনাথ বালক-বালিকাকে ঠকাইয়া লইতে পারে, অর্থের জন্য যে-কোনরূপ অন্যায় কার্য্য করিতে যাহার দ্বিধা নাই, সে যদি কেবল তৃণভোজন করিয়াও জীবন ধারণ করে, তথাপি সে পশু হইতেও অধম। যাহার হৃদয়ে কখনও অপরের অনিষ্টচিন্তা পর্য্যন্ত উদিত হয় না, যিনি শুধু বন্ধুর নহে, পরম শত্রুর সৌভাগ্যেও আনন্দিত, সারা জীবন শূকর-মাংস খাইলেও তিনিই প্রকৃত ভক্ত, তিনিই প্রকৃত যোগী, তিনিই সকলের গুরু। সুতরাং এইটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, বাহ্য ক্রিয়াকলাপ কেবল অন্তঃশুদ্ধির সহায়কমাত্র; যেখানে বাহ্যবিষয়ে অত খুঁটিনাটি-বিচার অসম্ভব হইয়া পড়ে, সেখানে কেবল অন্তঃশৌচ-অবলম্বনই যথেষ্ট। সেই লোককে ধিক্, সেই জাতিকে ধিক্, যে লোক, যে জাতি ধর্ম্মের সার ভুলিয়া অভ্যাসবশে বাহ্য অনুষ্ঠানগুলিকে মরণ-কামড়ে ধরিয়া থাকে, কোন মতে ছাড়িতে চাহে না। যদি ঐ অনুষ্ঠানগুলি আধ্যাত্মিক জীবনের বিশেষ সহায়ক হয়, তবেই উহাদের উপযোগিতা আছে, বলিতে হইবে। প্রাণশূন্য, আন্তরিকতা-হীন হইলে উহাদিগকে নির্দ্দয়ভাবে উৎপাটন করিয়া ফেলা উচিত।

'অনবসাদ' বা বল ভক্তিলাভের আর একটি সাধন। শ্রুতি বলেন, "বলহীন ব্যক্তি তাঁহাকে লাভ করিতে পারে না।"* এখানে শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার দৌর্ব্বল্য লক্ষিত হইয়াছে। 'বলিষ্ঠ, দ্রঢ়িষ্ঠ' ব্যক্তিই প্রকৃত শিষ্যের উপযুক্ত। দুর্ব্বল, শীর্ণকায়, জরাজীর্ণ ব্যক্তি কি সাধন করিবে? শরীর ও মনের মধ্যে যে অদ্ভুত শক্তিসমূহ লুক্কায়িত আছে, কোনরূপ যোগাভ্যাসের দ্বারা তাহারা কিঞ্চিৎ পরিমাণে জাগ্রত হইলেও দুর্ব্বল ব্যক্তি একেবারে নষ্ট হয়। 'যুবা, সুস্থকায়, সবল' ব্যক্তিই সিদ্ধ হইতে পারেন, সুতরাং শারীরিক বল না থাকিলে চলিবে না। ইন্দ্রিয়সংযমের প্রতিক্রিয়া খুব সবল দেহই সহ্য করিতে পারে। অতএব ভক্ত হইতে যাঁহার সাধ তাঁহার সবল ও সুস্থকায় হওয়া আবশ্যক। যাহারা অতি দুর্ব্বল, তাহারা যদি কোনরূপ যোগাভ্যাসের চেষ্টা করে, তবে হয় তাহারা কোন অচিকিৎস্য ব্যাধিগ্রস্ত হইবে, নতুবা মনকে ভয়ানক দুর্ব্বল করিয়া ফেলিবে। ইচ্ছাপূর্ব্বক শরীরকে দুর্ব্বল করা ভক্তি বা জ্ঞানলাভের জন্য অত্যাবশ্যক ব্যবস্থা নহে।

যাহার চিত্ত দুর্ব্বল, সেও আত্মলাভে কৃতকার্য্য হয় না। যে ভক্ত হইতে ইচ্ছুক, তাহার সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকা আবশ্যক। পাশ্চাত্ত্য জগতে আদর্শ ধার্ম্মিকের লক্ষণ এই—সে কখনও হাসিবে না, তাহার মুখ সর্ব্বদা বিষাদমেঘে আবৃত থাকিবে। তাহার উপর চোয়াল বসা ও মুখ লম্বা হওয়া আবশ্যক। শুষ্কশরীর ও

* নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।

—মুণ্ডকোপনিষৎ, ৩।২।৪

লম্বামুখ লোক ভিষকের যত্ন লইবার জিনিস বটে, কিন্তু তাহারা যোগী নহে। সন্তুষ্টচিত্ত ব্যক্তিই অব্যবসায়শীল হইতে পারে। দৃঢ়চেতা ব্যক্তিই সহস্র বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইতে পারে। মায়ার দুর্ভেদ্য জাল-ভেদ-রূপ মহা কঠিন কার্য্য কেবল মহাবীরগণের দ্বারাই সম্ভব।

কিন্তু তাহা বলিয়া অতিরিক্ত আমোদে মাতিলে চলিবে না (অনুদ্ধর্ষ)। অতিরিক্ত হাস্যকৌতুক আমাদিগকে গভীর চিন্তায় অক্ষম করিয়া ফেলে। উহাতে মানসিক শক্তিসমূহের বৃথা ক্ষয় হয়। ইচ্ছাশক্তি যত দৃঢ় হয়, নানাবিধ ভাবের বশে উহা তত কম বিচলিত হয়। দুঃখজনক গম্ভীর ভাব যেমন খারাপ, অতিরিক্ত আমোদও তদ্রূপ। যখন মন সামঞ্জস্যপূর্ণ স্থির শান্তভাবে থাকে তখনই সর্ব্বপ্রকার আধ্যাত্মিক অনুভূতি সম্ভব।

এই সকল সাধন দ্বারা ক্রমশঃ ঈশ্বরভক্তির উদয় হইতে থাকে।

পরাভক্তি—ত্যাগ

এক্ষণে আমরা গৌণী ভক্তির কথা শেষ করিয়া পরাভক্তির আলোচনা আরম্ভ করিলাম। এক্ষণে এই পরাভক্তি-অভ্যাসে প্রস্তুত হইবার একটি বিশেষ সাধনের কথা বলিতে হইবে। সর্ব্বপ্রকার সাধনের উদ্দেশ্য আত্মশুদ্ধি। নামসাধন, প্রতীক, প্রতিমাদির উপাসনা ও অন্যান্য অনুষ্ঠান কেবল আত্মার শুদ্ধিসাধনের জন্য। কিন্তু শুদ্ধিকারক সমুদয় সাধনের মধ্যে ত্যাগই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—উহা ব্যতীত কেহ এই পরাভক্তির রাজ্যে প্রবেশই করিতে পারে না। অনেকের পক্ষে এই ত্যাগ অতি ভয়াবহ ব্যাপার বোধ হইতে পারে, কিন্তু উহা ব্যতীত কোনরূপ আধ্যাত্মিক উন্নতিই সম্ভব নহে; সকল যোগেই এই ত্যাগ আবশ্যক। এই ত্যাগই ধর্ম্মের সোপান—সমুদয় সাধনের অন্তরঙ্গ সাধন। ত্যাগই প্রকৃত ধর্ম্ম। যখন মানবাত্মা সংসারের সমুদয় বস্তু দূরে ফেলিয়া গভীর তত্ত্বসমূহের অনুসন্ধান করে, যখন সে বুঝিতে পারে আমি দেহরূপ জড়ে বদ্ধ হইয়া জড় হইয়া যাইতেছি এবং ক্রমশঃ বিনাশের পথে অগ্রসর হইতেছি বুঝিয়াই জড়পদার্থ হইতে আপনার দৃষ্টি সরাইয়া লয়, তখনই ত্যাগ আরম্ভ হয়, তখনই প্রকৃত আধ্যাত্মিক উন্নতি আরম্ভ হয়। কর্ম্মযোগী সমুদয় কর্ম্মফল ত্যাগ করেন, তিনি যে-সকল কর্ম্ম করেন; তাহার ফলে আসক্ত হন না। তিনি ঐহিক বা পারত্রিক কোন লাভের জন্য আগ্রহান্বিত হন না। রাজযোগী বুঝেন, সমুদয় প্রকৃতির লক্ষ্য—পুরুষ বা আত্মাকে বিচিত্র সুখদুঃখানুভূতি

করান। আর ইহার ফল—প্রকৃতি হইতে তাঁহার নিত্য-স্বতন্ত্রত্ববোধ। মানবাত্মাকে জানিতে হইবে, তিনি অনন্তকালের জন্য আত্মস্বরূপই ছিলেন, আর ভূতের সহিত তাঁহার সংযোগ কেবল সাময়িক, ক্ষণিকমাত্র। রাজযোগী প্রকৃতির সমুদয় সুখদুঃখ ভোগ করিয়া ঠেকিয়া বৈরাগ্য শিখেন। জ্ঞানযোগীর বৈরাগ্য সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর। কারণ প্রথম হইতে এই সত্যবৎ প্রতীয়মান প্রকৃতিকে তাঁহাকে মিথ্যা বলিয়া জানিতে হয়। তাঁহাকে বুঝিতে হয়, প্রকৃতিতে যত কিছু শক্তিপ্রকাশ দেখিতেছি, সবই আত্মার শক্তি, প্রকৃতির নহে। তাঁহাকে প্রথম হইতেই জানিতে হয়, আত্মাতেই সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, প্রকৃতিতে কিছুই নাই। সুতরাং তাঁহাকে কেবল বিচারজনিত ধারণার বলে একেবারে সমুদয় প্রাকৃতিক ব[illegible] ছিন্ন করিতে হয়। প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সমুদয় পদার্থের দি[illegible] তিনি দৃষ্টিই করেন না, সেগুলি ছায়াবাজির ন্যায় তাঁহার সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়। তিনি স্বয়ং কৈবল্যপদে অবস্থিত হইতে চেষ্টা করেন।

সকল প্রকার বৈরাগ্য অপেক্ষা ভক্তিযোগীর বৈরাগ্য খুব স্বাভাবিক। ইহাতে কোন কঠোরতা নাই, কিছু ছাড়িতে হয় না, আমাদিগের নিকট হইতে কোন জিনিস ছিনিয়া লইতে হয় না—কোন কিছু হইতে জোর করিয়া আমাদিগকে তফাৎ করিতে হয় না। ভক্তের ত্যাগ অতি সহজ—অতি স্বাভাবিক। আমরা এইরূপ ত্যাগ অন্ততঃ বিকৃতরূপে আমাদের চতুর্দ্দিকে দেখিতে পাইতেছি। কোন ব্যক্তি কোন স্ত্রীলোককে ভালবাসে। কিছুদিন বাদে সে আর একজনকে ভালবাসিল। তখন ঐ প্রথম স্ত্রীলোকটির

চিন্তা তাহার মন হইতে চলিয়া গেল। তাহার মন হইতে উহার চিন্তা অতি ধীরভাবে ক্রমশঃ সহজে অপসৃত হইয়া গেল। তাহাকে আর সেই স্ত্রীলোকের অভাবজনিত ক্লেশ সহ্য করিতে হইল না। কোন স্ত্রীলোক কোন পুরুষকে ভালবাসিতেছে। সে আবার যখন অপর এক পুরুষকে ভালবাসে, তখন এই প্রথম পুরুষটির ভাব যেন তাহার মন হইতে সহজেই চলিয়া যায়। কোন লোক হয়ত নিজের শহরকে ভালবাসে। ক্রমশঃ সে নিজের দেশকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিল। তখন তাহার নিজের ক্ষুদ্র শহরের জন্য যে প্রগাঢ় ভালবাসা, তাহা স্বভাবতঃই চলিয়া গেল। আবার মনে কর, কোন লোক সমুদয় জগৎকে ভালবাসিতে শিখিল, তখন তাহার স্বদেশানুরাগ, নিজ দেশের জন্য প্রবল উন্মত্ত ভালবাসা চলিয়া যায়। তাহাতে তাহার কিছু কষ্ট হয় না। এ ভাব তাড়াইবার জন্য তাহাকে কিছু জোরজবরদস্তি করিতে হয় না। অশিক্ষিত লোক ইন্দ্রিয়সুখে উন্মত্ত, শিক্ষিত হইতে থাকিলে সে জ্ঞানচর্চ্চায় অধিকতর সুখ পাইতে থাকে। তখন সে বিষয়ভোগে তত সুখ পায় না। কুকুর ব্যাঘ্র খাদ্য পাইলে যেরূপ স্ফূর্ত্তির সহিত ভোজন করিতে থাকে, কোন মানুষের পক্ষে সেরূপ স্ফূর্ত্তির সহিত ভোজন সম্ভবপর নহে। আবার মানুষ বুদ্ধিবলে নানাবিষয় জ্ঞাত হইয়া ও নানা কার্য্য সম্পাদন করিয়া যে সুখ অনুভব করে, কুকুরের তাহা কখনও স্বপ্নেও অনুভব হয় না। প্রথমে ইন্দ্রিয় হইতে সুখানুভূতি হইয়া থাকে। কিন্তু যখন কোন পশু উন্নতভূমিতে আরোহণ করে তখন সে এই নিম্নজাতীয় সুখ আর তত আগ্রহের সহিত সম্ভোগ করিতে পারে না। মনুষ্যসমাজের মধ্যেও দেখা যায়, মানুষ যতই পশুর তুল্য হয়, সে ইন্দ্রিয়সুখ ততই

তীব্রভাবে অনুভব করে। আর যতই তাহার শিক্ষাদির উন্নতি হয়, ততই বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা ও এতদ্বিধ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়ে তাহার সুখানুভূতি হইতে থাকে। এইরূপ যখন আবার মনুষ্য বুদ্ধির বা মনোবৃত্তির অতীত ভূমিতে আরোহণ করে, যখন সে আধ্যাত্মিকতা ও ভগবত্তত্ত্বানুভূতির ভূমিতে আরোহণ করে, তখন সে এমন এক আনন্দের অবস্থা লাভ করে, যাহার তুলনায় ইন্দ্রিয় অথবা বুদ্ধিবৃত্তি-পরিচালন-জনিত সুখ শূন্যস্বরূপে প্রতিভাত হয়। যখন চন্দ্র উজ্জ্বলভাবে কিরণমালা বিকিরণ করে, তখন তারাগণ নিষ্প্রভ হইয়া যায়। আবার তপনের প্রকাশ হইলে চন্দ্রও নিষ্প্রভ-ভাব ধারণ করে। ভক্তির জন্য যে বৈরাগ্যের প্রয়োজন, তাহা কোন কিছুকে নাশ করিয়া উৎপন্ন হয় না। যেমন কোন ক্রম-বর্দ্ধমান আলোকের নিকট অল্পোজ্জ্বল আলোক স্বভাবতঃই ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হইতে নিষ্প্রভতর প্রতীত হয়, পরিশেষে একেবারে অন্তর্হিত হয়, তদ্রূপ ভগবৎপ্রেমোন্মত্ততায় ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি-পরিচালনজনিত সুখসমূহ স্বভাবতঃই নিষ্প্রভ হইয়া যায়। এই ঈশ্বর-প্রেম ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া এমন এক ভাব ধারণ করে, যাহাকে পরাভক্তি কহে। তখনই এই প্রেমিক পুরুষের পক্ষে অনুষ্ঠানের আর আবশ্যকতা থাকে না, শাস্ত্রের কোন প্রয়োজন থাকে না, প্রতিমা, মন্দির, ভজনালয়, বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়, দেশ, জাতি, এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ ভাব ও বন্ধন আপনা হইতেই চলিয়া যায়। কিছুতেই তাঁহাকে বাঁধিতে পারে না, কিছুতেই তাঁহার স্বাধীনতা নষ্ট করিতে পারে না। জাহাজ হঠাৎ চুম্বকপ্রস্তরের পাহাড়ের নিকট আসিলে পেরেকগুলি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে আর তক্তাগুলি

জলের উপর ভাসিতে থাকে। ভগবৎকৃপা এইরূপে আত্মার স্বরূপ-প্রকাশের বিঘ্নসমূহ অপসারিত করিয়া দেয়। তখন উহা মুক্ত হইয়া যায়। সুতরাং ভক্তিলাভের উপায়-স্বরূপ এই বৈরাগ্যসাধনে কোন কঠোরতা নাই, কোন কর্কশ বা শুষ্ক ভাব নাই, কোনরূপ জোরজবরদস্তি নাই। ভক্তকে তাঁহার হৃদয়ের কোনও ভাবকেই চাপিয়া রাখিতে হয় না। তিনি বরং সেই-সকল ভাবকে প্রবল করিয়া ভগবানের দিকে চালনা করেন।

ভক্তের বৈরাগ্য প্রেমপ্রসূত

প্রকৃতিতে আমরা সর্ব্বত্রই প্রেমের বিকাশ দেখিতে পাই। সমাজের মধ্যে যাহা কিছু সুন্দর ও মহৎ সমস্তই প্রেমপ্রসূত, আবার মন্দ পৈশাচিক ব্যাপারগুলিও সেই একই প্রেমভাবের বিকৃতরূপ-মাত্র। পতিপত্নীর বিশুদ্ধ দাম্পত্যপ্রেম এবং অতি নীচ কামবৃত্তি উভয়ই সেই একই প্রেমের বিকাশমাত্র। ভাব একই, তবে বিভিন্ন অবস্থায় উহার বিভিন্ন রূপ। এই একই প্রেমের ভাল বা মন্দ দিকে পরিচালনার ফলে কেহ বা দরিদ্রকে সর্ব্বস্ব অর্পণ করেন, কেহ বা নিজ ভ্রাতার গলা কাটিয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করে। শেষোক্ত ব্যক্তি নিজেকে যেমন ভালবাসে, প্রথমোক্ত ব্যক্তি অপরকে সেইরূপ ভালবাসে। তবে শেষোক্ত স্থলে প্রেম মন্দদিকে পরিচালিত; কিন্তু অপরস্থলে উহা যথার্থ বিষয়ে প্রযুক্ত। যে অগ্নি আমাদের খাদ্যপাকে সহায়তা করে, তাহাই আবার একটি শিশু-দাহেরও কারণ হইতে পারে। ইহাতে অগ্নির কিছু দোষ নাই, ব্যবহারগুণে ফলের তারতম্য হয় মাত্র। অতএব এই প্রেম, এই প্রবল আসঙ্গস্পৃহা, দুইজনের একপ্রাণ হইবার জন্য এই প্রবল আগ্রহ, আবার হয়ত অবশেষে সকলের সেই একই স্বরূপে বিলীন হইবার ইচ্ছা উত্তম বা অধমভাবে সর্ব্বত্র প্রকাশিত।

ভক্তিযোগ প্রেমের উচ্চতম বিকাশের বিজ্ঞানস্বরূপ। উহা আমাদিগকে প্রেমকে যথার্থ পথে পরিচালনা করিবার, উহাকে আয়ত্তাধীনে রাখিবার, উহার সদ্ব্যবহার করিবার, উহাকে একটি

নূতন পথে প্রধাবিত করিবার ও উহা হইতে শ্রেষ্ঠ ও মহত্তম ফল অর্থাৎ জীবন্মুক্ত অবস্থা লাভ করিবার উপায় প্রদর্শন করে। ভক্তিযোগ কিছু ত্যাগ করিতে শিক্ষা দেয় না, কেবল বলে "সেই পরমপুরুষে আসক্ত হও।" আর যিনি পরমপুরুষের প্রেমে উন্মত্ত, তাঁহার নীচ বিষয়ে স্বভাবতঃই কোন আসক্তি থাকিতে পারে না।

"আমি তোমার সম্বন্ধে আর কিছু জানি না, কেবল জানি তুমি আমার। তুমি সুন্দর, আহা! তুমি অতি সুন্দর, তুমি স্বয়ং সৌন্দর্য্যস্বরূপ।" ভক্তিযোগ বলেন, "হে মানব, সুন্দর বস্তুর প্রতি তুমি স্বভাবতঃই আকৃষ্ট; ভগবান্ পরম সুন্দর, তুমি তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভালবাস।" মনুষ্যমুখে, আকাশে, তারায় অথবা চন্দ্রে যে সৌন্দর্য্যের বিকাশ দেখা যায়, তাহা কোথা হইতে আসিল? উহা সেই ভগবানের সর্ব্বতোমুখী প্রকৃত সৌন্দর্য্যের আংশিক প্রকাশমাত্র। "তাঁহারই প্রকাশে সকলের প্রকাশ।"* ভক্তির এই উচ্চভূমিতে দণ্ডায়মান হও। উহা একেবারে তোমাদের ক্ষুদ্র আমিত্বভাব ভুলাইয়া দিবে। জগতের ক্ষুদ্র স্বার্থপর আসক্তিসমূহ ত্যাগ কর। কেবল মনুষ্যজাতিকে তোমার মানবীয় ও তদপেক্ষা উচ্চতর কার্য্যপ্রবৃত্তির একমাত্র লক্ষ্য মনে করিও না। সাক্ষিস্বরূপে অবস্থিত হইয়া প্রকৃতির সমুদয় ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ কর। মানুষের প্রতি আসক্তিশূন্য হও। দেখ, জগতে এই প্রবল প্রেম-প্রবাহ কিরূপে কার্য্য করিতেছে। কখনও কখনও

* তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি। কঠ, ২।২।১৫

হয়ত একটা ধাক্কা আসিল। উহাও সেই পরমপ্রেমলাভের চেষ্টার আনুষঙ্গিক ব্যাপারমাত্র। হয়ত কোথাও একটু দ্বন্দ্ব ঘটিল, হয়ত কাহার পদস্খলন হইল, কিন্তু এ সকলগুলিই সেই পরমপ্রেমে আরোহণের সোপানমাত্র। ঘটুক যত ইচ্ছা দ্বন্দ্ব, আসুক যত ইচ্ছা সংঘর্ষ, তুমি সাক্ষিস্বরূপ হইয়া একটু দূরে অবস্থিত হও। যখন তুমি এই সংসারপ্রবাহের মধ্যে পতিত থাক, তখনই ঐ ধাক্কাগুলি তোমার লাগিয়া থাকে। কিন্তু যখনই উহার বাহিরে আসিয়া কেবল সাক্ষিস্বরূপে অবস্থিত হইবে, তখন তুমি দেখিবে অনন্ত প্রকারে প্রেমস্বরূপ ভগবান্ প্রকাশ পাইতেছেন।

"যথানেই একটু আনন্দ দেখিতে পাওয়া যায়, ঘোর বিষয়ানন্দ হইলেও সেখানে সেই অনন্ত আনন্দস্বরূপ স্বয়ং ভগবানের অংশ রহিয়াছে, বুঝিতে হইবে।" অতি নীচতম আসক্তিতেও ভগবৎপ্রেমের বীজ লুক্কায়িত। সংস্কৃত ভাষায় ভগবানের একটি নাম 'হরি'। ইহার অর্থ এই—তিনি সকলকেই আপনার দিকে টানিতেছেন। বাস্তবিক তিনিই আমাদের ভালবাসার একমাত্র উপযুক্ত পাত্র। এই যে আমরা নানাদিকে আকৃষ্ট হইতেছি, কিন্তু আমাদিগকে টানিতেছে কে? তিনিই আমাদিগকে তাঁহার কোলের দিকে ক্রমাগত টানিতেছেন। প্রাণহীন জড়—সে কি কখন চৈতন্যবান্ আত্মাকে টানিতে পারে? কখনই নহে। একখানি সুন্দর মুখ দেখিয়া একজন উন্মত্ত হইল। গোটাকতক জড়-পরমাণু কি তাহাকে পাগল করিল? কখনই নহে। ঐ জড়-পরমাণুসমূহের অন্তরালে নিশ্চয়ই ঐশ্বরিক শক্তি ও ঐশ্বরিক প্রেমের ক্রীড়া বিদ্যমান। অজ্ঞ লোকে উহা জানে না। কিন্তু তথাপি

জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সে উহার দ্বারাই, কেবল উহার দ্বারাই আকৃষ্ট হইতেছে। সুতরাং দেখা গেল, অতি নীচতম আসক্তিও মানুষের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে, সেই প্রভাব ঐশ্বরিক প্রভাবেরই কিরণমাত্র। "হে প্রিয়তমে, পতির জন্য পতিকে কেহ ভালবাসে না, পতির অন্তরস্থ আত্মার জন্যই লোকে পতিকে ভালবাসে।"* প্রেমিকা পত্নীগণ ইহা জানিতেও পারে, না জানিতেও পারে, কিন্তু তথাপি উক্ত তত্ত্বটি সত্য। "হে প্রিয়তমে, পত্নীর জন্য পত্নীকে কেহ ভালবাসে না, কিন্তু পত্নীর অন্তরস্থ আত্মার জন্যই পত্নী প্রিয়া হয়।"† এইরূপ কেহই নিজ সন্তানকে অথবা আর কাহাকেও তাহাদের জন্য ভালবাসে না। তাহাদের অন্তরস্থ আত্মার জন্যই তাহাদিগকে ভালবাসিয়া থাকে। ভগবান্ যেন একটি বৃহৎ চুম্বক-প্রস্তরস্বরূপ। আমরা যেন লৌহচূর্ণের ন্যায়। আমরা সকলেই সদাসর্ব্বদা তাঁহার দ্বারা আকৃষ্ট হইতেছি। আমরা সকলেই তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি। জগতে এই যে নানাবিধ চেষ্টা—এই সকলের একমাত্র লক্ষ্য কেবল স্বার্থ হইতে পারে না। অজ্ঞ ব্যক্তিগণ জানে না, তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি। বাস্তবিক তাহারা ক্রমাগত সেই পরমাত্মরূপ বৃহৎ

---

* ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি।

—বৃহদারণ্যক, ২ অঃ, ৪ ব্রাঃ

† ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি।

—বৃহদারণ্যক, ২ অঃ, ৪ ব্রাঃ

চুম্বকের দিকে অগ্রসর হইতেছে। আমাদের এই কঠোর জীবন-সংগ্রামের লক্ষ্য—পরিণামে তাঁহার নিকট যাওয়া ও তাঁহার সহিত একীভূত হওয়া।

ভক্তিযোগী এই জীবন-সংগ্রামের অর্থ বোঝেন। তিনি এই সংগ্রাম অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন; সুতরাং তিনি ইহার লক্ষ্য কি তাহা জানেন, এই কারণে তিনি প্রাণের সহিত ইচ্ছা করেন যাহাতে বিষয়াকর্ষণের আবর্তে পড়িয়া হাবু-ডুবু খাইতে না হয়। তিনি সকল আকর্ষণের মূলকারণস্বরূপ হরির নিকট একেবারে যাইতে চাহেন। ভক্তের ত্যাগ ইহাই—ভগবানের প্রতি এই মহান্ আকর্ষণ তাঁহার আর সকল আসক্তিকে নাশ করিয়া দেয়। এই প্রবল অনন্ত প্রেম তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া অন্যান্য আসক্তিকে তথায় থাকিতে দেয় না। অন্য আসক্তি তখন কিরূপে থাকিবে? তখন ভক্ত স্বয়ং ভগবান্-রূপ প্রেমসমুদ্রের জলে আপনার হৃদয়কে পরিপূর্ণ দেখেন। তথায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রেমের স্থান নাই। তাৎপর্য্য এই—ভক্তের বৈরাগ্য অর্থাৎ ভগবান্ ভিন্ন সমুদয় বিষয়ে অনাসক্তি ভগবানের প্রতি তাঁহার পরম অনুরাগ হইতে উৎপন্ন হয়।

পরাভক্তিলাভের জন্য এইরূপ ভাবে প্রস্তুত হওয়াই আবশ্যক। এই বৈরাগ্যলাভ হইলে পরাভক্তির উচ্চতম শিখরে উঠিবার দ্বার যেন খুলিয়া যায়। তখনই আমরা বুঝিতে আরম্ভ করি, পরাভক্তি কি। আর যিনি পরাভক্তির রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, একমাত্র তাঁহারই বলিবার অধিকার আছে যে, প্রতিমাপূজা বা বাহ্য অনুষ্ঠানাদির আর আবশ্যক নাই। তিনিই

কেবল তথাকথিত মানুষের ভ্রাতৃভাবরূপ পরম প্রেমাবস্থা লাভ করিয়াছেন। অপরে কেবল ভ্রাতৃভাব, ভ্রাতৃভাব বলিয়া বৃথা চীৎকার করে মাত্র। তিনি তখন আর কোন ভেদ দেখিতে পান না। মহান্ প্রেমসমুদ্র তাঁহার অন্তরে তখন প্রবেশ করিয়াছে। তখন তিনি মানুষের ভিতর আর মানুষ দেখেন না, তিনি সর্ব্বত্র তাঁহার প্রিয়তমকে দেখিতে পান। যাহার মুখের দিকে তিনি দৃষ্টি করেন, তাহারই ভিতর তিনি হরির প্রকাশ দেখিতে পান। সূর্য্য বা চন্দ্রের আলোক তাঁহারই প্রকাশমাত্র। যেখানেই কোন সৌন্দর্য্য বা মহত্ত্ব দেখা যায়, তাঁহার দৃষ্টিতে সবই সেই ভগবানের। এরূপ ভক্ত এখনও জগতে আছেন। জগৎ কখনই একেবারে ভক্তবিরহিত হয় না। এইরূপ ব্যক্তিই সর্পদষ্ট হইলে বলে, আমার প্রিয়তমের নিকট হইতে দূত আসিয়াছিল। এইরূপ ব্যক্তিরই কেবল সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব সম্বন্ধে কথা কহিবার অধিকার আছে। তাঁহার হৃদয়ে কখন ক্রোধ, ঘৃণা অথবা ঈর্ষার উদয় হয় না। বাহ্য, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমুদয় তাঁহার নিকট হইতে অন্তর্হিত। তাঁহার ক্রোধোদয়ের কি সম্ভাবনা থাকে, যখন প্রেমবলে অতীন্দ্রিয় সত্যকে তিনি সর্ব্বদা দেখিতে সক্ষম ?

ভক্তিযোগের স্বাভাবিকতা ও উহার রহস্য

অর্জ্জুন শ্রীভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,* "যাঁহারা সর্ব্বদা অবহিত হইয়া তোমার উপাসনা করেন আর যাঁহারা অব্যক্ত, নির্গুণের উপাসক, ইহাদের মধ্যে কাহারা শ্রেষ্ঠ যোগী?" শ্রীভগবান্ বলেন, "যাঁহারা আমাতে মন সংলগ্ন

অর্জ্জুন উবাচ

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ॥

শ্রীভগবানুবাচ

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥
যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥
ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দ্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥
যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥

—শ্রীভগবদ্গীতা, ১২শ অধ্যায়, ১ম হইতে ৭ম শ্লোক

করিয়া নিত্যযুক্ত হইয়া পরম শ্রদ্ধার সহিত আমার উপাসনা করেন, তাঁহারাই আমার শ্রেষ্ঠ উপাসক, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ যোগী। যাঁহারা নির্গুণ, অনির্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্ব্বব্যাপী, অচিন্ত্য, নির্ব্বিকার, অচল নিত্যস্বরূপকে ইন্দ্রিয়সংযম ও বিষয়ে সমবুদ্ধি অবলম্বন করিয়া উপাসনা করেন, সেই সর্ব্বভূতহিতেরত ব্যক্তিগণও আমায় লাভ করেন। কিন্তু যাঁহাদের মন অব্যক্তে আসক্ত, তাঁহাদের অধিকতর কষ্ট হইয়া থাকে। কারণ দেহাভিমানী ব্যক্তি অতি কষ্টে এই অব্যক্ত গতি লাভ করিতে পারে। কিন্তু যাঁহারা সমুদয় কার্য্য আমাতে সমর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া আমার ধ্যান ও উপাসনা করেন, আমি তাঁহাদিগকে শীঘ্রই পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুরূপ মহাসমুদ্র হইতে উদ্ধার করি, কারণ তাঁহাদের মন সর্ব্বদাই আমার প্রতি সম্পূর্ণরূপে আসক্ত।" এখানে জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ উভয়কেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। এমন কি, উদ্ধৃতাংশে উভয়েরই লক্ষণ প্রকাশ করা হইয়াছে, বলা যাইতে পারে। জ্ঞানযোগ অবশ্য অতি শ্রেষ্ঠ মার্গ। তত্ত্ববিচার উহার প্রাণ। আর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সকলেই ভাবে জ্ঞানযোগের আদর্শ অনুসারে চলিতে সে সমর্থ। কিন্তু বাস্তবিক জ্ঞানযোগ-সাধন বড় কঠিন ব্যাপার। উহাতে অনেক বিপদাশঙ্কা আছে।

জগতে দুই প্রকার লোক দেখিতে পাওয়া যায়। একদল আসুরী প্রকৃতি—ইহারা এই শরীরটাকে সুখস্বাচ্ছন্দ্যে রাখাই জীবনের চরম উদ্দেশ্য জ্ঞান করে। আর যাঁহারা দেবপ্রকৃতি, তাঁহারা এই শরীরকে কেবল কোন বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের উপায়স্বরূপ মনে করেন। তাঁহারা মনে করেন, উহা যেন আত্মার উন্নতিসাধনের যন্ত্র-বিশেষমাত্র। শয়তান নিজ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য শাস্ত্র উদ্ধৃত করিতে

পারে, করিয়াও থাকে। সুতরাং জ্ঞানমার্গ যেমন সাধুব্যক্তির সৎকার্য্যের প্রবল উৎসাহদাতা, তদ্রূপ অসাধু ব্যক্তিরও কার্য্যের যেন সমর্থক বলিয়া প্রতীত হয়। জ্ঞানযোগে ইহাই মহা বিপদাশঙ্কা। কিন্তু ভক্তিযোগ অতি স্বাভাবিক ও মধুর। ভক্ত জ্ঞানযোগীর মত খুব উঁচুতেও উঠেন না, সুতরাং তাঁহার গভীর পতনের আশঙ্কাও নাই। এইটুকু বুঝিতে হইবে যে, সাধক যে পথই অবলম্বন করুন না কেন, যতদিন না সমুদয় বন্ধনমোচন হইতেছে, ততদিন তিনি কখনই মুক্ত হইতে পারেন না।

নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকগুলিতে দেখা যায়, কিরূপে জনৈকা ভাগ্যবতী গোপনারীর জীবাত্মার বন্ধনরূপ পাপপুণ্য ক্ষয় হইয়াছিল। "ভগবানের চিন্তাজনিত পরমহ্লাদে তাঁহার সমুদয় পুণ্যকর্ম্মজনিত বন্ধন ক্ষয়প্রাপ্ত হইল, আর তাঁহার অপ্রাপ্তিজনিত মহাদুঃখে তাঁহার সমুদয় পাপ ধৌত হইয়া গেল। তখন সেই গোপকন্যা মুক্তিলাভ করিলেন।"* এই শাস্ত্রবাক্য হইতে বেশ বুঝা যায়, ভক্তিযোগের গুহ্য রহস্য এই যে, মনুষ্যহৃদয়ে যত প্রকার বাসনা বা ভাব আছে, উহার কোনটিই স্বরূপতঃ মন্দ নহে; উহাদিগকে ধীরে ধীরে আমাদের বশবর্ত্তী করিয়া ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চাভিমুখী করিতে হইবে, যতদিন না উহারা চরমোৎকর্ষ লাভ করে। উহাদের সর্ব্বোচ্চ গতি

* তচ্চিন্তাবিপুলাহ্লাদক্ষীণপুণ্যচয়া তথা।
তদপ্রাপ্তিমহাদুঃখবিলীনাশেষপাতকা॥
চিন্তয়ন্তী জগৎসূতিং পরব্রহ্মস্বরূপিণম্।
নিরুচ্ছ্বাসতয়া মুক্তিং গতান্যা গোপকন্যকা॥
—বিষ্ণুপুরাণ, ৫ম অংশ, ১৩শ অধ্যায়, ২১।২২ শ্লোক

ভগবান্, উহাদের অন্যান্য সকল গতিই নিম্নাভিমুখী। আমাদের জীবনে সুখ ও দুঃখ পুনঃ পুনঃ ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। যখন কোন লোক ধন অথবা ঐরূপ কোন সাংসারিক বস্তুর অপ্রাপ্তি-হেতু দুঃখ অনুভব করে, তখন বুঝিতে হইবে সে তাহার প্রবৃত্তিকে মন্দ দিকে পরিচালনা করিতেছে। তথাপি দুঃখের প্রয়োজনীয়তা আছে। লোকে যদি 'কেন আমি সেই পরম পুরুষকে লাভ করিতে পারিলাম না', 'কেন আমি ভগবান্‌কে পাইলাম না' বলিয়া যন্ত্রণায় অস্থির হয়, সেই যন্ত্রণা তাহার মুক্তির কারণ হইবে। কয়েকটি মুদ্রা পাইলে যখন তোমার আহ্লাদ হয়, তখন বুঝিতে হইবে তুমি তোমার আহ্লাদ-বৃত্তিকে মন্দ দিকে পরিচালনা করিতেছ। উহাকে উচ্চতর বিষয়ে প্রেরণ করিতে হইবে, আমাদের সর্বোচ্চ লক্ষ্য ভগবানের চিন্তায় আনন্দ বোধ করিতে হইবে। অন্যান্য ভাব সম্বন্ধেও এই একই কথা। ভক্ত বলেন, 'উহাদের কোনটিই মন্দ নহে'; সুতরাং তিনি ঐগুলির মোড় ফিরাইয়া ভগবানের দিকে লইয়া যান।

ভক্তির অবস্থাভেদ

ভক্তি নানাভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে।* প্রথম—শ্রদ্ধা। লোকে মন্দির ও তীর্থস্থানসমূহের প্রতি এত শ্রদ্ধাসম্পন্ন কেন? এই সকল স্থানে তাঁহার পূজা হয় বলিয়া, এই সকল স্থানে গেলে তাঁহার ভাবের উদ্দীপনা হয় বলিয়া এই সকল স্থানের সহিত তাঁহার সত্তা জড়িত। সকল দেশেই লোকে ধর্ম্মাচার্য্যগণের প্রতি এত শ্রদ্ধাসম্পন্ন কেন? তাঁহারা সকলেই যে সেই এক ভগবানের মহিমাই প্রচার করেন। মানুষ তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন না হইয়া কি থাকিতে পারে? এই শ্রদ্ধার মূল ভালবাসা। আমরা যাহাকে ভালবাসি না, তাঁহার প্রতি আমরা শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইতে পারি না। তাহার পর প্রীতি—ভগবচ্চিন্তায় আনন্দানুভব। মানুষ বিষয়ে কি বিজাতীয় আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে! মানুষ ইন্দ্রিয়সুখকর দ্রব্য লাভ করিতে সর্ব্বত্রই যাইয়া থাকে, মহা বিপদেরও সম্মুখীন হয়। ভক্তের চাই এই তীব্র ভালবাসা। ভগবানের দিকে এই ভালবাসার মোড় ফিরাইতে হইবে। তৎপরে বিরহ—প্রেমাস্পদের অভাবজনিত মহাদুঃখ। এই দুঃখ জগতে সকল দুঃখের মধ্যে মধুর—অতি মধুর। যখন মানুষ 'ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারিলাম না, যে জিনিস জানিবার তাহা জানিলাম না' বলিয়া অতিশয় ব্যাকুল হয় এবং

* সম্মান-বহুমানপ্রীতিবিরহেতর-বিচিকিৎসা মহিমখ্যাতিতদর্থ প্রাণস্থানতদীয়তাসর্ব্বতদ্ভাবাপ্রাতিকূল্যাদীনি চ স্মরণেভ্যো বাহুল্যাৎ।

—শাণ্ডিল্যসূত্র, ২য় অধ্যায়, ১ম আহ্নিক, ৪৪ সূত্র

তজ্জন্য যন্ত্রণায় অস্থির ও উন্মত্ত হইয়া উঠে, তখনই বিরহ আসিয়াছে বুঝিতে হইবে। মনের এইরূপ অবস্থা হইলে প্রেমাস্পদ ব্যতীত আর কিছু ভাল লাগে না (ইতর-বিচিকিৎসা)। পার্থিব প্রেমে উন্মত্ত প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে এই বিরহ প্রায়ই দেখা যায়। স্ত্রীপুরুষের পরস্পর যথার্থ প্রণয় হইলে তাঁহারা যাঁহাদিগকে ভাল না বাসেন, তাঁহাদের নিকট থাকিতে স্বভাবতঃই একটু বিরক্তি অনুভব করেন। এইরূপে যখন পরাভক্তি হৃদয়ে তাহার প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে, তখন ঐ ভক্তির বিরোধী বিষয় সম্বন্ধে মনে এইরূপ বিরক্তি আসিয়া থাকে। তখন ভগবান্ ব্যতীত অন্য বিষয়ে কথা কহাও ভক্তের পক্ষে বিরক্তিকর হইয়া পড়ে। "তাঁহার বিষয়ে, কেবল তাঁহার বিষয়ে চিন্তা কর, অন্য সকল কথা ত্যাগ কর।"* যাঁহারা তাঁহার সম্বন্ধে কথাবার্তা কহেন, ভক্ত তাঁহাদিগকে বন্ধু বলিয়া মনে করেন, কিন্তু যাঁহারা অন্য বিষয়ে কথা কহেন, তাঁহারা তাঁহার পক্ষে শত্রুরূপে প্রতীয়মান হন। যখন ভক্তের এই অবস্থা আসে যে এই শরীরধারণ কেবল একমাত্র তাঁহার উপাসনার জন্য, তখন তিনি ভক্তির আর এক উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিয়াছেন বুঝিতে হইবে। তখন উহা ব্যতীত এক মুহূর্তের জন্যও জীবনধারণ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব বোধ হয়, আর সেই প্রিয়তমের চিন্তা হৃদয়ে বর্তমান থাকে বলিয়াই এই জীবনধারণে সুখবোধ হয়। এই অবস্থার শাস্ত্রীয় নাম তদর্থপ্রাণস্থান। তদীয়তা—

---

* তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা
বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ।
—মুণ্ডক উপনিষদ্ ২য় মুণ্ডক, ২য় খণ্ড, ৫ম শ্লোক

ভক্তিমতে সাধক যখন সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হন, তখন এই তদীয়তা আসে। যখন তিনি ভগবৎপাদপদ্মস্পর্শবলে কৃতার্থ হইয়া যান, তখন তাঁহার প্রকৃতি বিশুদ্ধ হইয়া যায়—সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া যায়; তখন তাঁহার জীবনের সমুদয় সাধ পূর্ণ হইয়া যায়। তথাপি এইরূপ অনেক ভক্ত কেবল তাঁহার উপাসনার জন্যই জীবনধারণ করেন। এই জীবনে ইহাই একমাত্র সুখ—তাঁহারা তাহা ছাড়িতে চাহেন না। "হে রাজন্, হরির এতাদৃশ মনোহর গুণরাশি যে, যাঁহারা একেবারে পরম তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন, যাঁহাদের হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে, তাঁহারাও ভগবানকে নিষ্কাম ভক্তি করিয়া থাকেন।* (যে ভগবান্‌কে সকল দেবগণ, মুমুক্ষু ও ব্রহ্মবাদীরাও উপাসনা করিয়া থাকেন।†) প্রেমের প্রভাবই এই। যখন একেবারে 'আমি-আমার'-জ্ঞান থাকে না, তখনই এই তদীয়তা লাভ হয়। তখন তাঁহার নিকট সকলই পবিত্র বলিয়া বোধ হয়, কারণ সবই যে তাঁহার প্রেমাস্পদের। সাংসারিক প্রেমেও প্রেমাস্পদের সকল জিনিসই প্রেমিকের চক্ষে পবিত্র ও প্রিয় বলিয়া বোধ হয়। নিজের হৃদয়ধনের এক টুক্‌রা বস্ত্রখণ্ডও সে ভালবাসে; এরূপে যে ভগবান্‌কে ভালবাসে, সে সমুদয় জগৎকেও ভালবাসে; কারণ সমুদয় জগৎ তাঁহার।

* আত্মারামাশ্চ মুনয়োনির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিং ইত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥
—শ্রীমদ্ভাগবত, ১ম স্কন্ধ, ৭ম অধ্যায়, ১০ম শ্লোক

† যং সর্ব্বে দেবা নমস্যন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চ।
—নৃসিংহপূর্ব্বতাপনী উপনিষদ্, ২.৪

সার্ব্বজনীন প্রেম

প্রথমে সমষ্টিকে ভালবাসিতে না শিখলে ব্যষ্টিকে ভালবাসা যায় না। ঈশ্বরই সমষ্টি। সমস্ত জগৎটাকে যদি এক অখণ্ডস্বরূপে চিন্তা করা যায় তাহাই ঈশ্বর, আর জগৎটাকে যখন পৃথক্ পৃথক্ রূপে দেখা যায় তখনই ইহা জগৎ—ব্যষ্টি। সমষ্টিকে—সেই সর্ব্বব্যাপীকে—যে এক অখণ্ড বস্তুর মধ্যে ক্ষুদ্রতর অখণ্ড বস্তুসমূহ অবস্থিত, তাঁহাকে ভালবাসিলেই সমগ্র জগৎকে ভালবাসা সম্ভব। ভারতীয় দার্শনিকগণ ব্যষ্টি লইয়াই ক্ষান্ত নহেন, তাঁহারা ব্যষ্টির দিকে ক্ষিপ্রভাবে দৃষ্টিপাত করেন এবং তৎপরেই ব্যষ্টি বা বিশেষ ভাবগুলি যে-সকল সামান্য ভাবের অন্তর্গত, তাহাদের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন। সর্ব্বভূতের মধ্যে এই সামান্য ভাবের অন্বেষণই ভারতীয় দর্শন ও ধর্ম্মের লক্ষ্য। যাহাকে জানিলে সমুদয় জানা যায়, সেই সমষ্টিভূত, এক, নিরপেক্ষ, সর্ব্বভূতের মধ্যগত সামান্য ভাবস্বরূপ পুরুষকে জানাই জ্ঞানীর লক্ষ্য। যাঁহাকে ভালবাসিলে এই চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি ভালবাসা জন্মে, ভক্ত সেই সর্ব্বগত পুরুষ-প্রধানকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে চাহেন, যোগী আবার সেই সকলের মূলীভূত শক্তিকে জয় করিতে চাহেন—যাহাকে জয় করিলে সমুদয় জগৎকে জয় করা যায়। ভারতবাসীর মনের গতির ইতিহাস পর্য্যবেক্ষণ করিলে জানা যায়, কি জড়বিজ্ঞান, কি মনোবিজ্ঞান, কি ভক্তিতত্ত্ব, কি দর্শন—সর্ব্ব বিভাগেই উহা চিরকালই এই বহুর মধ্যে এক সর্ব্বগত তত্ত্বের এই অপূর্ব্ব অনুসন্ধানে ব্যস্ত। ভক্ত ক্রমে

এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, যদি তুমি একে একে একজনের পর আর একজনকে ভালবাসিতে থাক, তবে তুমি অনন্তকালের জন্ম উত্তরোত্তর অধিক সংখ্যক ব্যক্তিকে ভালবাসিয়া যাইতে পার, কিন্তু সমগ্র জগৎকে একেবারে ভালবাসিতে কখনই সমর্থ হইবে না। কিন্তু অবশেষে যখন এই মূল সত্য অবগত হওয়া যায় যে, ঈশ্বর সমুদয় প্রেমের সমষ্টিস্বরূপ, মুক্ত মুমুক্ষু বদ্ধ জগতের সকল জীবাত্মার আদর্শসমষ্টিই ঈশ্বর, তখনই তাঁহার পক্ষে সার্ব্বজনীন প্রেম সম্ভব হইতে পারে। ভগবান্ সমষ্টি এবং সেই পরিদৃশ্যমান জগৎ ভগবানের পরিচ্ছিন্ন ভাব, ভগবানের অভিব্যক্তি মাত্র। সমষ্টিকে ভালবাসিলেই সমুদয় জগৎকেই ভালবাসা হইল। তখনই জগতের প্রতি ভালবাসা ও জগতের হিতসাধন সবই সহজ হইবে। প্রথমে ভগবৎপ্রেমের দ্বারা আমাদিগকে এই শক্তিলাভ করিতে হইবে, নতুবা জগতের হিতসাধন পরিহাসের বিষয় হইবে। ভক্ত বলেন, "সমুদয়ই তাঁর, তিনি আমার প্রিয়তম, আমি তাঁহাকে ভালবাসি।" এইরূপ ভক্তের নিকট সমুদয় পবিত্র বলিয়া বোধ হয়, কারণ সবই তাঁর। সকলেই তাঁহার সন্তান, তাঁহার অঙ্গস্বরূপ, তাঁহারই প্রকাশযোগ্য। তখন কি প্রকারে অপরের প্রতি হিংসা করিতে পারি? কিরূপেই বা অপরকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারি? ভগবৎপ্রেম আসিলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিশ্চিত ফলস্বরূপ সর্ব্বভূতে প্রেম আসিবে। আমরা যতই ভগবানের দিকে অগ্রসর হই, ততই সমুদয় বস্তুকে তাঁহার ভিতর দেখিতে পাই। যখন জীবাত্মা এই পরম প্রেমানন্দসম্ভোগে কৃতকার্য্য হন, তখন ঈশ্বরকে সর্ব্বভূতে দর্শন করিতে আরম্ভ করেন। এইরূপে আমাদের

হৃদয় প্রেমময় এক অনন্ত প্রস্রবণ হইয়া দাঁড়ায়। যখন আমরা এই প্রেমের আরও উচ্চতর স্তরে উপনীত হই, তখন এই জগতের সকল পদার্থের মধ্যে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্থক্য আছে, প্রেমিকের দৃষ্টিতে সব সম্পূর্ণরূপে চলিয়া যায়। মানুষকে আর মানুষ বলিয়া বোধ হয় না, ভগবান্ বলিয়া বোধ হয়; অপরাপর প্রাণীকেও আর সেই সেই প্রাণী বলিয়া বোধ হয় না, তাহারাও তখন তাঁহার দৃষ্টিতে ভগবান। এমন কি, ব্যাঘ্রকেও ব্যাঘ্র বলিয়া বোধ হইবে না, ভগবানেরই রূপ বলিয়া বোধ হইবে। এইরূপে এই প্রগাঢ় ভক্তির অবস্থায় সর্ব্বভূতই আমাদের উপাস্য হইয়া পড়ে। "হরিকে সর্ব্বভূতে অবস্থিত জানিয়া জ্ঞানী ব্যক্তির সর্ব্বভূতের প্রতি অব্যভিচারিণী ভক্তি প্রয়োগ করা উচিত।" * এইরূপ প্রগাঢ় সর্ব্বগ্রাহী প্রেমের ফল পূর্ণ আত্মনিবেদন। তখন দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, সংসারে ভাল-মন্দ যাহা কিছু ঘটে, কিছুই আমাদের অনিষ্টকর নহে—অপ্রাতিকূল্য। তখনই সেই প্রেমিক পুরুষ দুঃখ আসিলে বলিতে পারেন, 'এস দুঃখ'—কষ্ট আসিলে বলিতে পারেন, 'এস কষ্ট, তুমিও আমার প্রিয়তমের নিকট হইতে আসিতেছ।' সর্প আসিলে সর্পকেও তিনি স্বাগত বলিতে পারেন। মৃত্যু আসিলে এরূপ ভক্ত মৃত্যুকে সহাস্যে অভিনন্দন করিতে পারেন। 'ধন্য আমি, আমার নিকট ইহারা আসিতেছে, আসুক সকলে।' ভগবান্ ও যাহা কিছু তাঁহার—সেই সকলের প্রতি প্রগাঢ় প্রেম হইতে প্রসূত এই পূর্ণ নির্ভরের

* এবং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভক্তিরব্যভিচারিণী।
কর্ত্তব্যা পণ্ডিতৈর্জ্ঞাত্বা সর্বভূতময়ং হরিম্॥

অবস্থায় ভক্তের নিকট সুখ ও দুঃখের বিশেষ প্রভেদ থাকে না। তিনি তখন দুঃখে আর বিরক্তিভাব অনুভব করেন না। আর প্রেমস্বরূপ ভগবানের ইচ্ছায় এইরূপ বিরুক্তিপরিশূন্য নির্ভর অবশ্যই মহাবীরত্বপূর্ণ ও ক্রিয়াকলাপজনিত যশোরাশি অপেক্ষা অধিকতর বাঞ্ছনীয়। অধিকাংশ মানবই দেহ-সর্ব্বস্ব। দেহই তাহাদের চক্ষে সমগ্র জগতের তুল্য, দেহের সুখই তাহাদের সব। এই দেহ ও দৈহিক ভোগ্য বস্তুর উপাসনারূপ মহাসুর আমাদের সকলের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। আমরা খুব লম্বাচৌড়া কথা বলতে পারি, খুব উঁচু উঁচু বিষয় বলিতে পারি, কিন্তু তথাপি আমরা শকুনির মত। আমরা যতই উচ্চে উঠিয়াছি মনে করি না কেন, আমাদের মন কিন্তু শকুনির মত ভাগাড়ে মড়ার গলিত মাংসখণ্ডের উপর আকৃষ্ট। জিজ্ঞাসা করি, আমাদের শরীরকে ব্যাঘ্রের কবল হইতে রক্ষা করিবার প্রয়োজন কি? আমরা ব্যাঘ্রকে উহা দিতে পারি না কেন? উহাতে ত ব্যাঘ্রের তৃপ্তি হইবে, আর উহার সহিত আত্মোৎসর্গ ও উপাসনার কতটুকু প্রভেদ? অহংকে তুমি কি সম্পূর্ণরূপে নাশ করিতে পার? প্রেমধর্ম্মের ইহা অতি উচ্চ চূড়া, আর অতি অল্প লোকই এই অবস্থায় আরোহণ করিয়াছে। কিন্তু যতদিন না মানুষ সর্ব্বদা এইরূপ আত্মত্যাগের জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে প্রস্তুত হয়, ততদিন সে পূর্ণ ভক্ত হইতে পারে না। আমরা সকলেই অল্পাধিক সময়ের জন্য শরীরটাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারি এবং অল্পাধিক স্বাস্থ্য-সম্ভোগও করিতে পারি, কিন্তু তাহাতে হইল কি? শরীর ত একদিন যাইবেই। শরীরের ত আর নিত্যতা নাই। ধন্য তাহারা যাহাদের শরীর অপরের সেবায় নাশ হয়। সাধু ব্যক্তি কেবল

অপরের সেবার জন্য ধন, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে সদা প্রস্তুত হইয়া থাকেন। এই জগতে মৃত্যুই একমাত্র সত্য — এখানে যদি আমাদের দেহ কোন মন্দ কার্য্যে না গিয়া ভাল কার্য্যে যায়, তবে তাহাই খুব ভাল বলিতে হইবে। আমরা কোনরূপে পঞ্চাশ—জোর একশ বছর বাঁচিতে পারি, কিন্তু তার পর? তার পরে কি হয়? যে-কোন বস্তু মিশ্রণে উৎপন্ন, তাহাই বিশ্লিষ্ট হইয়া বিনষ্ট হইয়া যায়। এমন সময় আসিবে, যখন উহা বিশ্লিষ্ট হইবেই হইবে। ঈশা মরিয়াছেন, বুদ্ধ মরিয়াছেন, মহম্মদ মরিয়াছেন। জগতের সকল বড় বড় মহাপুরুষ এবং আচার্য্যেরাও মরিয়াছেন। ভক্ত বলেন, এই ক্ষণস্থায়ী জগতে, যেখানে সবই ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, এখানে আমরা যতটুকু সময় পাই তাহারই সদ্ব্যবহার করা আবশ্যক। আর বাস্তবিকই জীবনের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য জীবনকে সর্ব্বভূতের সেবায় বিনিয়োগ করা। এই ভয়ানক দেহাত্মবুদ্ধিই জগতে সর্ব্বপ্রকার স্বার্থপরতার মূল। আমাদের মহাভ্রম এই যে, আমাদের এই শরীরটি আমি, আর যে কোন প্রকারে হউক, উহাকে রক্ষা ও উহার স্বচ্ছন্দতা বিধান করিতে হইবে। যদি তুমি নিশ্চিত জানিতে পার যে, তুমি শরীর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, তবে এই জগতে এমন কিছুই নাই যাহার সহিত তোমার বিরোধ উপস্থিত হইবে; তখন তুমি সর্ব্বপ্রকার স্বার্থপরতার অতীত হইয়া গেলে। এই হেতু ভক্ত বলেন, "আমাদিগকে জগতের সকল পদার্থ সম্বন্ধে মৃতবৎ থাকিতে হইবে" এবং উহাই বাস্তবিক আত্মসমর্পণ—শরণাগতি—যাহা হইবার হউক। "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক"—এই বাক্যের অর্থই এই প্রকার আত্মসমর্পণ বা

শরণাগতি। সংসারের সহিত সংগ্রাম করা এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে করা—ভগবানের ইচ্ছানুক্রমেই আমাদের দুর্ব্বলতা ও সাংসারিক আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়া থাকে। কিন্তু নির্ভরের অর্থ তাহা নহে। হইতে পারে, আমাদের স্বার্থপূর্ণ কার্য্যাদি হইতে ভবিষ্যতে আমাদের মঙ্গল হয়, কিন্তু সে বিষয় ভগবান্ দেখিবেন, তাহাতে তোমার আমার কিছু করিবার নাই। প্রকৃত ভক্ত নিজের জন্য কখন কোন ইচ্ছা বা কার্য্য করেন না। "প্রভু, লোকে তোমার নামে বড় বড় মন্দির নির্ম্মাণ করে, তোমার নামে কত দান করে, আমি দরিদ্র, আমি অকিঞ্চন, আমার দেহ তোমার পাদপদ্মে সমর্পণ করিলাম। প্রভু, আমায় ত্যাগ করিও না।" ইহাই ভক্তহৃদয়ের গভীর প্রদেশ হইতে উত্থিত প্রার্থনা। যিনি একবার এই অবস্থার আস্বাদ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট এই প্রিয়তম প্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ—জগতের সমুদয় ধন, প্রভুত্ব, এমন কি মানুষ যতদূর মানযশ ও ভোগসুখের আশা করিতে পারে, তাহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীত হয়। ভগবানে নির্ভরজনিত এই শান্তি আমাদের বুদ্ধির অতীত ও অমূল্য। এই অপ্রাতিকূল্য-অবস্থা লাভ হইলে তাঁহার কোনরূপ স্বার্থ থাকে না, আর স্বার্থই যখন নাই তখন আর তাঁহার স্বার্থ-হানিকর বস্তু জগতে কি থাকিতে পারে? এই পরম নির্ভরাবস্থায় সর্ব্বপ্রকার আসক্তি সম্পূর্ণরূপে দূর হয়, কেবল সেই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা ও আধারস্বরূপ ভগবানের প্রতি সর্ব্বাবগাহিনী প্রেমাত্মিকা আসক্তি রহিয়া যায়। ভগবানের প্রতি এই প্রেমের আকর্ষণ জীবাত্মার বন্ধনের কারণ নহে, বরং উহা তাহার সর্ব্ববন্ধন-মোচনে সাহায্য করে।

পরাবিদ্যা ও পরাভক্তি এক

উপনিষদ্ পরা ও অপরা বিদ্যা নামক দুইটি বিদ্যা ভিন্নরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। আর ভক্তের নিকটে এই পরাবিদ্যা ও পরাভক্তিতে বাস্তবিক কিছু প্রভেদ নাই। মুণ্ডক উপনিষদে কথিত আছে "ব্রহ্মজ্ঞানীরা বলেন, জানিবার উপযুক্ত দুই প্রকার বিদ্যা আছে—পরা ও অপরা। উহার মধ্যে অপরা বিদ্যা—ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা (উচ্চারণ, যতি ইত্যাদির বিদ্যা), কল্প (যজ্ঞপদ্ধতি), ব্যাকরণ, নিরুক্ত (বৈদিক শব্দসমূহের ব্যুৎপত্তি ও তাহাদের অর্থ যে শাস্ত্রের দ্বারা জানা যায়), ছন্দঃ ও জ্যোতিষ। আর পরাবিদ্যা তাহাই, যদ্দ্বারা সেই অক্ষরকে জানিতে পারা যায়।" * সুতরাং স্পষ্ট দেখা গেল যে, এই পরাবিদ্যা ও ব্রহ্মজ্ঞান এক পদার্থ। দেবীভাগবত আমাদিগকে পরাভক্তির এই নিম্নলিখিত লক্ষণ বলিয়া দিয়াছেন—"যেমন তৈল এক পাত্র হইতে পাত্রান্তরে ঢালিবার সময় অবিচ্ছিন্ন ধারায় পতিত হয়, তদ্রূপ মন যখন অবিচ্ছিন্নভাবে ভগবানকে স্মরণ করিতে থাকে, তখনই পরাভক্তির উদয় হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।" † অবিচ্ছিন্ন আসক্তির সহিত ভগবানের দিকে হৃদয় ও মনের এরূপ অবিরত

* দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।

—মুণ্ডকোপনিষৎ, ১ম মুণ্ডক, ১ম খণ্ড, ৪র্থ ও ৫ম শ্লোক

† চেতসো বর্তনঞ্চৈব তৈলধারাসমং সদা। ইত্যাদি—

—দেবীভাগবত, সপ্তম স্কন্ধ, ৩৭ অধ্যায়, ১২শ শ্লোক

ও নিত্য স্থিরতাই মানবহৃদয়ের সর্ব্বোচ্চ ভগবৎ-প্রেমের প্রকাশ; আর সকলপ্রকার ভক্তি কেবল এই পরাভক্তির—রাগানুগা ভক্তির সোপানমাত্র। যখন মানুষের হৃদয়ে পরানুরাগের উদয় হয়, তখন তাহার মন সর্ব্বদাই ভগবানের চিন্তা করিবে, আর কিছুই তাহার স্মৃতিপথে উদিত হইবে না। সে নিজ মনে তখন ভগবান্ ব্যতীত অন্য কোন চিন্তাকে স্থান দিবে না। তাহার আত্মা অভেদ্য পবিত্রতাবরণে আবৃত থাকিবে এবং মানসিক ও ভৌতিক সর্ব্বপ্রকার বন্ধনকে অতিক্রম করিয়া শান্ত ও মুক্ত ভাব ধারণ করিবে। এরূপ লোকই কেবল ভগবান্‌কে নিজ অন্তরে উপাসনা করিতে সক্ষম। তাঁহার নিকট অনুষ্ঠানপদ্ধতি, প্রতিমাদি, শাস্ত্রাদি মতামত সমুদয়ই অনাবশ্যক হইয়া পড়ে—উহাদের দ্বারা তাঁহার আর কোনও উপকার হয় না। ভগবান্‌কে এরূপভাবে ভালবাসা বড় সহজ কর্ম্ম নহে। সাধারণ মানবীয় প্রেম সেখানেই বৃদ্ধি পায়, যেখানে উহার প্রতিদান পায়। যেখানে প্রতিদান না পায়, সেখানে উদাসীনতাই আসিয়া প্রেমের স্থল অধিকার করে। নিতান্ত অল্প ক্ষেত্রেই কিন্তু কোনরূপ প্রতিদান না পাইলেও প্রেমের বিকাশ দেখা যায়। আমরা ইহাকে অগ্নির প্রতি পতঙ্গের ভালবাসার সহিত তুলনা করিতে পারি। পতঙ্গ আগুনকে ভালবাসে, আর উহাতে আত্মসমর্পণ করিয়া প্রাণত্যাগ করে। পতঙ্গের স্বভাবই এরূপ ভাবে ভালবাসা। জগতে যত প্রকার প্রেম দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে কেবল প্রেমের জন্যই যে প্রেম, তাহাই সর্ব্বোচ্চ ও পূর্ণ নিঃস্বার্থ প্রেম। এইরূপ প্রেম আধ্যাত্মিকতার ভূমিতে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেই পরাভক্তিতে লইয়া যায়।

প্রেম ত্রিকোণাত্মক

প্রেমকে আমরা একটি ত্রিকোণ-স্বরূপে প্রকাশ করিতে পারি। উহার প্রত্যেক কোণটিই যেন উহার এক-একটি অবিভাজ্য স্বরূপের প্রকাশক। তিন কোণ ব্যতীত কোন ত্রিকোণ হইতে পারে না। আর প্রকৃত প্রেমও উহার নিম্নলিখিত তিনটি লক্ষণ ব্যতীত কোনরূপেই থাকিতে পারে না। প্রেম-স্বরূপ এই ত্রিকোণের একটি কোণ এই যে, প্রেমে কোনরূপ কেনা-বেচা নাই। যেখানে কোন প্রতিদানের আশা থাকে, সেখানে প্রকৃত প্রেম জন্মিতে পারে না। উহা কেবল দোকানদারীতে পরিণত হয় মাত্র। যতদিন পর্যন্ত আমাদের ভগবানের প্রতি ভয়মিশ্রা ভক্তি ও তাঁহার আজ্ঞা-পালনের জন্য তাঁহার নিকট কোনরূপ বরপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা থাকে, ততদিন আমাদের হৃদয়ে প্রকৃত প্রেম জন্মিতে পারে না। যাহারা ভগবানের নিকট কিছু প্রাপ্তির আশায় উপাসনা করে, তাহারা ঐ বরপ্রাপ্তির আশা না থাকিলে তাঁহাকে উপাসনা করিবে না। ভক্ত ভগবান্‌কে ভালবাসেন তিনি প্রেমাস্পদ বলিয়া, প্রকৃত ভক্তের এই দেববাঞ্ছিত প্রেমোচ্ছ্বাসের আর কোন হেতু নাই। কথিত আছে, কোন সময়ে এক বনে এক রাজার সহিত জনৈক সাধুর সাক্ষাৎ হয়। তিনি সাধুর সহিত কিয়ৎক্ষণ আলাপ করিয়াই তাঁহার পবিত্রতা ও জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। পরিশেষে তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, "আমাকে কৃতার্থ করিবার জন্য আমার নিকট কিছু গ্রহণ করিতে হইবে।" সাধু

উহাতে অস্বীকৃত হইলেন, বলিলেন, "বনের ফল আমার প্রচুর আহার, পর্ব্বত-নিঃসৃত পবিত্র সরিৎ আমার পর্য্যাপ্ত পানীয়, বৃক্ষ-ত্বক্ আমার পর্য্যাপ্ত পরিধেয় এবং গিরিগুহা আমার যথেষ্ট বাসস্থান। কেন আমি তোমার কিংবা অপরের নিকট কোন কিছু লইব?" রাজা বলিলেন, "প্রভু, আমাকে অনুগৃহীত করিবার জন্য আমার হস্ত হইতে কিছু গ্রহণ করুন, আর আমার সহিত রাজধানীতে ও আমার রাজপ্রাসাদে চলুন।" অনেক অনুরোধের পর তিনি অবশেষে রাজার সহিত যাইতে স্বীকার করিলেন এবং তাঁহার প্রাসাদে গেলেন। দান করিতে উদ্যত হইবার পূর্ব্বে রাজা পুনঃ পুনঃ বর ভিক্ষা করিতে লাগিলেন, "প্রভু, আমার আরও সন্তান-সন্ততি হউক, আমার ধনবৃদ্ধি হউক, আমার রাজ্যবিস্তার হউক, আমার শরীর নীরোগ হউক, ইত্যাদি।" রাজা নিজ প্রার্থনা শেষ করিবার পূর্ব্বেই সাধু নীরবে উঠিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া রাজা হতবুদ্ধি হইয়া তাঁহার পশ্চাদ্গমন করিতে লাগিলেন—চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "প্রভু, চলিয়া গেলেন? আমার দান গ্রহণ করিলেন না?" সাধু তাঁহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ভিক্ষুক, আমি ভিক্ষুকের কাছে ভিক্ষা করি না। তুমি নিজে একজন ভিক্ষুক, তুমি আমাকে কি করিয়া কিছু দিতে পার? আমি এত মূর্খ নই যে, তোমার ন্যায় ভিক্ষুকের নিকট ভিক্ষা লইব। যাও, আমার অনুসরণ করিও না।" এখানে ভিক্ষুক আর ভগবানের প্রকৃত প্রেমিকদের ভিতর বেশ প্রভেদ করা হইয়াছে। এমন কি, মুক্তিলাভের জন্য ভগবানের উপাসনাও অধম উপাসনা। প্রেম কোন লাভ চাহে না। প্রেম কেবল প্রেমের জন্যই হইয়া থাকে।

ভক্ত ভগবান্‌কে ভালবাসেন, কারণ তিনি না ভালবাসিয়া থাকিতে পারেন না। তুমি একটি সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া উহাকে ভালবাসিলে। তুমি ঐ দৃশ্যের নিকট হইতে কোনরূপ অনুগ্রহ-ভিক্ষা কর না। আর সেই দৃশ্যও তোমার নিকট কিছুই প্রার্থনা করে না। তথাপি উহার দর্শনে তোমার মনে আনন্দের উদয় হয়—উহা তোমার মনের অশান্তি দূর করিয়া দেয়, উহা তোমাকে শান্ত করিয়া দেয়, তোমাকে ক্ষণকালের জন্য একরূপ নশ্বর প্রকৃতির বাহিরে লইয়া যায় এবং এক স্বর্গীয় আনন্দে উৎফুল্ল করিয়া তুলে। প্রেমের এই ভাবটি উক্ত ত্রিকোণাত্মক প্রেমের এক কোণ। প্রেমের পরিবর্তে কিছু চাহিও না। তুমি যেন কেবল দিয়াই যাইতে থাক। ভগবানকে তোমার প্রেম দাও, কিন্তু তাঁহার নিকট হইতেও তাহার পরিবর্তে কিছু চাহিও না।

প্রেমরূপ ত্রিকোণের দ্বিতীয় কোণ এই যে, প্রেমে কোনরূপ ভয় নাই। যাহারা ভগবান্‌কে ভয়ে ভালবাসে তাহারা মনুষ্যাধম, তাহাদের মনুষ্যত্বের এখনও স্ফূর্তি হয় নাই। তাহারা শাস্তির ভয়ে ভগবান্‌কে উপাসনা করে। তাহারা মনে করে তিনি এক মহান্ পুরুষ, তাঁহার এক হস্তে দণ্ড, এক হস্তে চাবুক; তাঁহার আজ্ঞাপালন না করিলে তাহারা দণ্ডিত হইবে। ভগবান্‌কে দণ্ডের ভয়ে উপাসনা অতি নিম্নশ্রেণীর উপাসনা। এইরূপ উপাসনাকে যদি উপাসনাই বলিতে হয়, তবে উহা প্রেমের অতি অপরিণত অবস্থা-মাত্র বলিতে হইবে। যতদিন হৃদয়ে কোনরূপ ভয় থাকে, ততদিন প্রেম-বিকাশের সম্ভাবনা কোথায়? প্রেম স্বভাবতঃই সমুদয় ভয়কে নাশ করিয়া ফেলে। মনে ভাবিয়া দেখ, ঐ তরুণী জননী পথে

দাঁড়াইয়া ; একটি কুক্কুর ডাকিলেই তিনি ভয় পাইয়া সন্নিহিত গৃহে প্রবেশ করেন। কিন্তু যদি তাঁহার শিশু তাঁহার সঙ্গে থাকে এবং যদি কোন একটি সিংহ শিশুটির উপর লাফাইয়া পড়ে, তখন সেই জননী কোথায় থাকিবেন মনে কর ? অবশ্য তখন তিনি সিংহমুখে প্রবিষ্ট হইবেন। প্রেম বাস্তবিকই সমুদয় ভয়কে নাশ করিয়া ফেলে। পাছে জগতের সম্পর্ক নষ্ট হইয়া যায়, এই প্রকার একটি স্বার্থপর ভাব হইতে ভয় জন্মে। আমি নিজকে যত ক্ষুদ্র ও স্বার্থপর করিয়া ফেলিব, আমার ভয়ও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। যদি কেহ বিবেচনা করে সে কিছুই নহে, তাহার নিশ্চয়ই ভয় আসিবে। আর তুমি নিজেকে ক্ষুদ্র বলিয়া যত কম ভাবিবে, তত তোমার ভয় কমিয়া যাইবে। যতদিন তোমাতে একবিন্দুও ভয় আছে, ততদিন তোমাতে প্রেম থাকিতে পারে না। প্রেম ও ভয় দুইটি বিপরীতভাবাপন্ন। যাঁহারা ভগবানকে ভালবাসেন, তাঁহারা তাঁহাকে কখনই ভয় করিবেন না। প্রকৃত ভগবৎপ্রেমিক 'ভগবানের নাম বৃথা লইও না' এই আদেশ শুনিয়া হাস্য করেন। প্রেমের ধর্ম্মে ভগবন্নিন্দা আবার কোথায় ? যেরূপেই হউক না কেন, তুমি প্রভুর নাম যত লইতে পার, ততই মঙ্গল। তুমি তাঁহাকে ভালবাস, তাই তুমি তাঁহার নাম করিতেছ।

প্রেমরূপ ত্রিকোণের তৃতীয় কোণটি এই যে, প্রেমিকের আর দ্বিতীয় ভালবাসার পাত্র থাকিবে না, কারণ উহাই প্রেমিকের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ হইবে। যতদিন না আমাদের ভালবাসার পাত্র আমাদের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ হইয়া দাঁড়ায়, ততদিন প্রকৃত প্রেম আসিতে পারে না। হইতে পারে অনেক স্থলে মানুষের প্রেম

মন্দ দিকে প্রযুক্ত হয়, কিন্তু প্রেমিক লোকের পক্ষে তাঁহার প্রিয় বস্তুই তাঁহার সর্ব্বোচ্চ আদর্শ। কোন ব্যক্তি অতি কুৎসিত লোকের ভিতর আপনার উচ্চ আদর্শ দেখিতে পায়, আবার অপরে খুব ভাল লোকে উহা দেখিতে পায়, কিন্তু সকল স্থলেই কেবল আদর্শটিকেই প্রকৃত প্রগাঢ়রূপে ভালবাসা হইয়া থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তির উচ্চতম আদর্শকেই ঈশ্বর বলে। অজ্ঞান হউন, জ্ঞানী হউন, সাধু হউন, পাপী হউন, নর বা নারী, শিক্ষিত বা অশিক্ষিত সকল মনুষ্যেরই উচ্চতম আদর্শ ঈশ্বর। সমুদয় সৌন্দর্য্য, মহত্ত্ব ও শক্তির উচ্চতম আদর্শসমূহের সমষ্টি করিলেই প্রেমময় ও প্রেমাস্পদ ভগবানের পূর্ণতম ভাব পাওয়া যায়। এই আদর্শগুলি প্রত্যেক ব্যক্তির মনে কোন না কোনরূপে স্বভাবতঃই বর্ত্তমান। উহারা যেন আমাদেরই মনের অঙ্গ বা অংশবিশেষ। মানবপ্রকৃতিতে যে-সকল ক্রিয়ার বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, উহারা সকলেই আদর্শগুলিকে ব্যবহারিক জীবনে পরিণত করিবার চেষ্টা-স্বরূপ। আমরা আমাদের চতুর্দ্দিকে সমাজে যে নানাবিধ ব্যাপার ও আন্দোলন দেখিতে পাই, তাহা ভিন্ন ভিন্ন আত্মার বিভিন্ন আদর্শকে কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টার ফলমাত্র। যাহা ভিতরে আছে, তাহাই বাহিরে আসিবার চেষ্টা করিতেছে। মানবহৃদয়ে আদর্শের এই চিরপ্রবল প্রভাবই সেই একমাত্র সর্ব্বনিয়ন্ত্রী মহাশক্তি, যাহার ক্রিয়া মানবজাতিমধ্যে নিয়ত বর্ত্তমান। হইতে পারে শত জন্ম সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া চেষ্টার পর মানুষ বুঝিতে পারে যে, আমাদের অভ্যন্তরস্থ আদর্শ বাহিরের অবস্থাসমূহের সহিত সম্পূর্ণ খাপ খাইতে পারে না।

এইটি বুঝিতে পারিলে সে বহির্জ্জগৎকে নিজের আদর্শমত গঠন করিবার চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া আদর্শকে সেই উচ্চতম প্রেমের ভূমি হইতে আদর্শরূপে উপাসনা করে। সমুদয় নিম্ন আদর্শগুলিই এই পূর্ণ আদর্শের অন্তর্গত। কথায় বলে এবং সকলেই একথার সত্যতা স্বীকার করিয়া থাকেন যে,

যার সঙ্গে যার মজে মন।
কিবা হাড়ী কিবা ডোম॥

বাহিরের লোক বলিতে পারে, প্রেম অপাত্রে প্রদত্ত হইতেছে, কিন্তু যিনি প্রেমিক, তিনি হাড়ী ডোম দেখেন না, তিনি তাহাকে রাজরাণী বলিয়াই দেখিয়া থাকেন। হাড়ী ডোমই হউক, আর রাজরাণীই হউক, প্রকৃতপক্ষে আমাদের প্রেমের আধারগুলি যেন কতকগুলি কেন্দ্রবিশেষ, যাহাদের চতুষ্পার্শ্বে আদর্শগুলি যেন ঘনীভূত হইয়া থাকে। জগৎ সাধারণতঃ কিসের উপাসনা করে? অবশ্য এইটি উচ্চতম ভক্ত ও প্রেমিকের সর্ব্বাবগাহী পূর্ণ আদর্শ নহে। নরনারীগণ সাধারণতঃ নিজ হৃদয়াভ্যন্তরীণ আদর্শকেই উপাসনা করে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ আদর্শ বাহিরে আনয়ন করিয়া তাহারই সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করে। এই কারণেই আমরা তাহারই সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করি। এই কারণেই আমরা দেখিতে পাই, যাহারা নিজেরা নিষ্ঠুর ও রক্তপিপাসু, তাহারা কেবল রক্তপিপাসু ঈশ্বরের উপাসনা করে, কারণ তাহারা কেবল নিজেদের উচ্চতম আদর্শকেই ভালবাসে। এই জন্যই সাধুব্যক্তির ঈশ্বরের আদর্শ অতি উচ্চ, আর তাঁহাদের আদর্শ অপর ব্যক্তির আদর্শ হইতে অত্যন্ত পৃথক্।

প্রেমের ভগবানের প্রমাণ তিনিই

যে প্রেমিক ব্যক্তি স্বার্থপরতা ও ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়াছেন এবং যাঁহার কোন ভয় নাই, তাঁহার আদর্শ কি? মহামহিমময় ঈশ্বরকেও তিনি বলিবেন, আমি তোমাকে আমার সর্ব্বস্ব দিব, তোমার নিকট হইতে আমি কিছুই চাহি না। বাস্তবিক এমন কিছুই নাই, যাহা আমি 'আমার' বলিতে পারি। যখন মানুষ এইরূপ অবস্থা লাভ করে, তখন তাহার আদর্শ পূর্ণ প্রেমের আদর্শ হইয়া দাঁড়ায়, উহা প্রেমজনিত পূর্ণ নির্ভীকতার আদর্শে পরিণত হয়। এইরূপ পুরুষের সর্ব্বোচ্চ আদর্শে কোন প্রকার বিশেষত্ব-রূপ সঙ্কীর্ণতা থাকে না। উহা সার্ব্বভৌম প্রেম, অনন্ত ও অসীম প্রেম, প্রেমস্বরূপ বা পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রেমের আকার ধারণ করে। প্রেমধর্ম্মের এই মহান্ আদর্শকে তখন কোনরূপ প্রতীক বা প্রতিমার সহায়তা না লইয়া তদ্রূপ উপাসনা করা হয়। ইহাই উৎকৃষ্ট পরাভক্তি—একটি সার্ব্বভৌম আদর্শকে আদর্শ বলিয়া উপাসনা করা। অন্য সকলপ্রকার ভক্তি কেবল ঐ ভক্তিলাভের সোপানমাত্র। এই প্রেমরূপ ধর্ম্মপথ অনুসরণ করিতে করিতে আমরা যে-সমস্ত সিদ্ধি বা অসিদ্ধি লাভ করি, সে-সমস্তই সেই একমাত্র আদর্শলাভের পথেই ঘটে অর্থাৎ প্রকারান্তরে তাহার সহায়তা করে। একটির পর একটি বস্তু গৃহীত হয় এবং আমাদের অভ্যন্তরবর্ত্তী আদর্শ উহার উপর একে একে প্রক্ষিপ্ত হইতে থাকে। ক্রমশঃ এই সমুদয় বাহ্যবস্তুই ক্রমবিস্তারশীল সেই

আভ্যন্তরীণ আদর্শের প্রকাশকের পক্ষে অনুপযুক্ত বোধ হয় এবং স্বভাবতঃই একটির পর আর একটি পরিত্যক্ত হয়। অবশেষে সেই সাধক বুঝিতে থাকেন যে, বাহ্যবস্তুতে আদর্শকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা বৃথা। আদর্শের সহিত তুলনায় সকল বাহ্য-বস্তুই অতি তুচ্ছ। কালক্রমে তিনি সেই সর্ব্বোচ্চ ও সম্পূর্ণ নির্ব্বিশেষভাবাপন্ন সূক্ষ্ম আদর্শকে সম্পূর্ণরূপে অন্তরেই জীবন্ত ও সত্যভাবে অনুভব করিবার সামর্থ্য লাভ করেন। যখন ভক্ত এই অবস্থায় উপনীত হন, তখন ভগবান্‌কে প্রমাণ করা যায় কি না, ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ কি না—এই সকল প্রশ্ন তাঁহার মনে উদিতই হয় না। তাঁহার নিকট ভগবান্ প্রেমময়, তিনি প্রেমের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ এবং এই ভাবই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট। তিনি প্রেমরূপ বলিয়া স্বতঃসিদ্ধ, অন্য প্রমাণনিরপেক্ষ। প্রেমিকের নিকট প্রেমময়ের অস্তিত্ব-প্রমাণের কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই। অন্যান্য ধর্ম্মের বিচারকস্বরূপ ভগবান্ প্রমাণ করিতে অনেক প্রমাণের আবশ্যক হয় বটে, কিন্তু ভক্ত ভগবানের সম্বন্ধে এরূপ ধারণা করিতে পারেন না বা করেনও না। তাঁহার নিকট ভগবান্ কেবল প্রেমস্বরূপে বর্ত্তমান। "কেহই পতিকে পতির জন্য ভালবাসে না, পতির অন্তর্ব্বর্ত্তী আত্মার জন্যই লোকে পতিকে ভালবাসে। কেহই পত্নীকে পত্নীর জন্য ভালবাসে না, পত্নীর অন্তর্ব্বর্ত্তী আত্মার জন্যই লোকে পত্নীকে ভালবাসে।" কেহ কেহ বলেন, "মানুষের সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মেরই মূল স্বার্থপরতা।" আমার বিবেচনায় উহাও প্রেম, তবে বিশিষ্টতাহেতু নিম্নভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছে মাত্র। যখন আমি আমাকে জগতের সকল বস্তুতে

অবস্থিত ভাবি, ঈশ্বর নিশ্চয়ই আমাতে স্বার্থপরতা থাকিতে পারে না। কিন্তু যখন আমি ভ্রমবশতঃ নিজেকে ক্ষুদ্র মনে করি, তখন আমার প্রেম সঙ্কীর্ণ ও বিশেষ ভাব ধারণ করে। প্রেমের বিষয়কে সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ করাই আমাদের ভ্রম। এই জগতের সকল বস্তুই ভগবৎ-প্রসূত, সুতরাং প্রেমের যোগ্য। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, সমষ্টিকে ভালবাসিলে অংশগুলিকেও ভালবাসা হইল। এই সমষ্টিই ভক্তের ভগবান্। আর অন্যান্য প্রকারের ঈশ্বর—স্বর্গস্থ পিতা, শাস্তা, স্রষ্টা, নানাবিধ মতামত, শাস্ত্র প্রভৃতি ভক্তের নিকট নিরর্থক, তাঁহাদের নিকট ইহার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই; কারণ তাঁহারা পরাভক্তির প্রভাবে একেবারে এই সকলের উপর চলিয়া গিয়াছেন। যখন অন্তর শুদ্ধ, পবিত্র এবং ঐশ্বরিক প্রেমামৃতে পূর্ণ হয়, তখন ভক্ত সর্ব্বপ্রকার ঈশ্বরের ধারণা বালকোচিত ও অসম্পূর্ণ বা অনুপযুক্ত বলিয়া পরিত্যক্ত হয়। বাস্তবিক পরাভক্তির প্রভাবই এইরূপ। তখন সেই উচ্চাবস্থাপন্ন ভক্ত তাঁহার ভগবান্‌কে মন্দিরাদিতে অন্বেষণ করিতে যান না; তিনি এমন স্থানই দেখিতে পান না, যেখানে তিনি নাই। তিনি তাঁহাকে মন্দিরের ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্র দেখিতে পান। তিনি তাঁহাকে সাধুর সাধুতায় ও পাপীর পাপে দেখিতে পান। ইহার কারণ, তিনি পূর্ব্বেই তাঁহাকে নিত্যদীপ্তিমান ও নিত্যবর্ত্তমান এক সর্ব্বশক্তিমান্, অনির্ব্বাণ প্রেমজ্যোতিরূপে নিজ হৃদয়ে স্বমহিমায় বিরাজমান দেখিতে পাইয়াছেন।

মানবীয় ভাষায় ভগবৎ-প্রেমের বর্ণনা

মানবীয় ভাষায় প্রেমের এই পরমোচ্চ পূর্ণ আদর্শের পরিচয় প্রদান করা অসম্ভব। উচ্চতম মানবকল্পনাও উহার অনন্ত পূর্ণতা ও সৌন্দর্য্য-অনুভবে অক্ষম। তথাপি সর্ব্বদেশের প্রেমধর্ম্মের নিম্ন-উচ্চ উভয় অবস্থার উপাসকগণকে তাঁহাদের প্রেমের আদর্শ অনুভব করিতে ও উহার লক্ষণ প্রকাশ করিতে চিরকালই এই অনুপযোগী মানবীয় ভাষা ব্যবহার করিতে হইয়াছে। শুধু ইহাই নহে, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের মানবীয় প্রেমই এই অব্যক্ত ভগবৎ-প্রেমের প্রতীক-রূপে গৃহীত হইয়াছে। মানব ঐশ্বরিক বিষয়সমূহ নিজের মানবীয় ভাবেই প্রকাশ করিতে পারে, আমাদের নিকট সেই পূর্ণ কেবল মাত্র আমাদের আপেক্ষিক ভাষায় প্রকাশিত হইতে পারে। সমুদয় জগৎ আমাদের নিকট আর কি? অনন্ত যেন সান্ত ভাষায় লিখিত মাত্র। এই কারণেই ভক্তেরা ভগবান্ ও তাঁহার প্রেমের উপাসনা-বিষয়ে লৌকিক প্রেমের লৌকিক শব্দসমূহ ব্যবহার করিয়া থাকেন। পরাভক্তির কয়েকজন ব্যাখ্যাতা এই পরাভক্তি নিম্নলিখিত বিভিন্ন উপায়ে বুঝিতে ও প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে সর্ব্বনিম্ন অবস্থাকে শান্ত ভক্তি বলে। যখন মানুষের হৃদয়ে প্রেমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয় নাই, যখন তাহার বুদ্ধি প্রেমের উন্মত্ততায় আত্মহারা হয় নাই, এই বাহ্য ক্রিয়াকলাপ বাহ্য ভক্তি হইতে একটু উন্নত সাদাসিদে রকম প্রেমের উদয় হইয়াছে মাত্র, যখন উহা তীব্রবেগসম্পন্ন প্রেমের উন্মত্ততালক্ষণে লক্ষিত নহে, এইরূপ

ভাবে ভগবানের উপাসনাকে শান্ত ভক্তি বা শান্ত প্রেম বলে। দেখিতে পাই, জগতে কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা ধীরে ধীরে সাধনপথে অগ্রসর হইতে ভালবাসেন। আর কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা ঝড়ের মত বেগে চলিয়া যান। শান্তভক্ত ধীর শান্ত নম্র। তদপেক্ষা একটু উচ্চতর অবস্থা—দাস্য। এ অবস্থায় মানুষ আপনাকে ঈশ্বরের দাস ভাবে। বিশ্বাসী ভৃত্যের প্রভুভক্তিই তাঁহার আদর্শ।

তার পর সখ্য-প্রেম—এই সখ্য-প্রেমের সাধক ভগবানকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া থাকেন, "তুমি আমার প্রিয় বন্ধু।"* যেমন মানুষ বন্ধুর নিকট আপনার হৃদয় খোলে, জানে যে বন্ধু তাহার দোষের জন্য তাহাকে কখনই তিরস্কার না করিয়া যাহাতে তাহার হিত হয়, তাহার চেষ্টা করিবে—বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে যেমন একটা সমান সমান ভাব থাকে, তদ্রূপ সখ্যপ্রেমের সাধক ও তাঁহার সখারূপ ভগবানের মধ্যে যেন একরকম সমান সমান ভাব থাকে। সুতরাং ভগবান্ আমাদের হৃদয়ের অতি সন্নিহিত বন্ধু হইলেন—সেই বন্ধুর নিকট আমরা আমাদের জীবনের সব কথা খুলিয়া বলিতে পারি, আমাদের অন্তরের গভীরতম প্রদেশের গুপ্তভাব-সকল তাঁহার নিকট জানাইতে পারি। সম্পূর্ণ ভরসা আছে যে, তিনি যাহাতে আমাদের মঙ্গল হয় তাহাই করিবেন। এই ভাবিয়া আমরা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হইতে পারি। এ অবস্থায় ভক্ত ভগবান্‌কে তাঁহার সমান মনে করেন—ভগবান্ যেন আমাদের

* ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।

—পাণ্ডবগীতা

খেলুড়ে, আমরা সকলে যেন এই জগতে খেলা করিতেছি। যেমন ছেলেরা খেলা করে, যেমন মহাযশস্বী রাজা-মহারাজগণও আপনাদের খেলা খেলিয়া যান, সেইরূপেই সেই প্রেমের আধার প্রভুও নিজে জগতের সহিত খেলা করিতেছেন। তিনি পূর্ণ—তাঁহার কিছুরই অভাব নাই। তাঁহার সৃষ্টি করিবার আবশ্যক কি? কার্য্য আমরা করি—উদ্দেশ্য কোন অভাবপূরণ। আর অভাব বলিতেই অসম্পূর্ণতা বুঝায়। ভগবান্ পূর্ণ—তাঁহার কোন অভাব নাই। কেন তিনি এই নিয়ত কর্ম্মময় সৃষ্টি লইয়া ব্যস্ত থাকেন? তাঁহার কি উদ্দেশ্য? ভগবানের সৃষ্টির উদ্দেশ্যবিষয়ে আমরা যে-সকল উপন্যাস কল্পনা করি, সে-গুলি গল্পহিসাবে সুন্দর হইতে পারে, কিন্তু উহাদের অন্য কোন মূল্য নাই। বাস্তবিক সবই তাঁর খেলা। এই জগৎ তাঁর খেলা—ক্রমাগত এই খেলা চলিতেছে। তাঁহার পক্ষে সমুদয় জগৎটি নিশ্চিতই একটি মজার খেলামাত্র। যদি তুমি খুব নিঃস্ব হও, তবে সেই নিঃস্বত্বকেই একটি মহা তামাশা বলিয়া বিবেচনা কর—বড় মানুষ হও ত ঐ বড়মানুষত্বকেই তামাশারূপে সম্ভোগ কর। বিপদ আসে ত তাহাই সুন্দর সুন্দর তামাশা, আবার সুখ পাইলে মনে করিতে হইবে, এও এক সুন্দর তামাশা। জগৎ কেবলমাত্র ক্রীড়াক্ষেত্র—আমরা এখানে বেশ নানারূপে মজা উড়াইতেছি—যেন খেলা হইতেছে, আর ভগবান্ আমাদের সহিত সর্ব্বদাই খেলা করিতেছেন, আমরাও তাঁহার সহিত খেলিতেছি। ভগবান্ আমাদের অনন্তকালের খেলুড়ে—অনন্তকালের খেলার সঙ্গী। কেমন সুন্দর খেলা করিতেছেন! খেলা সাঙ্গ হইল—এক যুগ

শেষ হইল। তারপর অল্লাধিক সময়ের জন্ম বিশ্রাম—তারপর আবার খেলা আরম্ভ—আবার জগতের সৃষ্টি! কেবল যখন ভুলিয়া যাও সবই খেলা, আর তুমিও এ খেলার সহায়ক, তখনই—কেবল তখনই দুঃখকষ্ট আসিয়া উপস্থিত হয়। তখনই হৃদয় গুরুভারাক্রান্ত হয়, আর সংসার তোমার উপর গুরুবিক্রমে চাপিয়া বসে। কিন্তু যখনই তুমি এই দুদণ্ড জীবনের পরিবর্তনশীল ঘটনাবলীতে সত্যবোধ ত্যাগ কর, আর যখন সংসারকে ক্রীড়ারঙ্গ-ভূমি ও আপনাদিগকে তাঁহার ক্রীড়াসহায়ক বলিয়া মনে কর, তৎক্ষণাৎ তোমার দুঃখ চলিয়া যাইবে। প্রতি অণুতে তিনি খেলা করিতেছেন। তিনি খেলা করিতে করিতে পৃথিবী, সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতেছেন। তিনি মনুষ্যহৃদয়, প্রাণী ও উদ্ভিদ্‌সমূহের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। আমরা তাঁহার দাবাবড়েস্বরূপ। তিনি সেইগুলিকে যেন একটি ছকে বসাইয়া তাহাদিগকে চালিত করিতেছেন। তিনি আমাদিগকে প্রথমে একদিকে, পরে অপর দিকে সাজাইতেছেন—আমরাও জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাঁহারই ক্রীড়ার সহায়ক। অহো, কি আনন্দ! আমরা তাঁহার ক্রীড়াসহায়ক।

তৎপরের অবস্থাকে বাৎসল্য-প্রেম বলে। উহাতে ভগবান্‌কে পিতা না ভাবিয়া সন্তান ভাবিতে হয়। এটি কিছু নূতন রকমের বোধ হইতে পারে, কিন্তু উহার উদ্দেশ্য আমাদের ভগবানের ধারণা হইতে ঐশ্বর্য্যের ভাবগুলি সব দূর করা। ঐশ্বর্য্যের ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই ভয় আসে। ভালবাসায় কিন্তু ভয় থাকা উচিত নয়। চরিত্র-গঠনের জন্ম ভক্তি ও আজ্ঞাবহতা-অভ্যাসের আবশ্যক বটে,

কিন্তু একবার চরিত্র গঠিত হইলে যখন প্রেমিক শান্ত-প্রেমের একটু আস্বাদ করেন, আবার প্রেমের তীব্র উন্মত্ততাও কিছু আস্বাদ করেন, তখন তাঁহার আর নীতিশাস্ত্র, সাধন-নিয়ম এ গুলির কিছুমাত্র প্রয়োজন থাকে না। প্রেমিক বলেন, ভগবান্‌কে মহামহিম, ঐশ্বর্য্যশালী, জগন্নাথ, দেবদেবরূপে ভাবিতে আমার ইচ্ছা হয় না। ভগবানের ধারণা হইতে এই ভয়োৎপাদক ঐশ্বর্য্যভাব তাড়াইবার জন্য তিনি ভগবান্‌কে সন্তান-রূপে ভালবাসেন। মা-বাপ ছেলের কাছে ভয় পায় না, ছেলের প্রতি তাঁহাদের ভক্তিও হয় না। তাঁহাদের ছেলের কাছে কিছু প্রার্থনা করিবারও থাকে না। ছেলের সর্ব্বদা পাওনারই দাবি। সন্তানের প্রতি ভালবাসার জন্য বাপ-মা শত শতবার শরীরত্যাগে প্রস্তুত। তাঁহাদের এক সন্তানের জন্য তাঁহারা সহস্র জীবন উৎসর্গে প্রস্তুত। এই ভাব হইতে ভগবান্‌কে বাৎসল্যভাবে ভালবাসা হয়। যে-সকল সম্প্রদায়ে ভগবান্ অবতার হন, যাঁহারা তাহাতে বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের মধ্যেই এই বাৎসল্যভাবে উপাসনা স্বাভাবিক। মুসলমানদের পক্ষে ভগবান্‌কে এইরূপে সন্তানভাবে ভাবা কঠিন। তাঁহারা ভয়ে এভাব হইতে দূরে অবস্থান করেন। কিন্তু খ্রীষ্টিয়ান ও হিন্দু সহজেই ইহা বুঝিতে পারেন, কারণ তাঁহাদের বালক যীশু, বাল-কৃষ্ণ রহিয়াছেন। ভারতীয় রমণীগণ অনেক সময়ে আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের মাতা বলিয়া চিন্তা করেন। খ্রীষ্টিয়ান জননীগণও আপনাদিগকে খ্রীষ্টের মাতা বলিয়া চিন্তা করিতে পারেন। ইহা হইতে পাশ্চাত্য প্রদেশে ঈশ্বরের মাতৃভাবের জ্ঞান আসিবে; আর ইহা তাঁহাদের বিশেষ

প্রয়োজন। ভগবানের প্রতি ভয়ভক্তিরূপ এই কুসংস্কার আমাদের অন্তরে অন্তরে দৃঢ়মূল হইয়া আছে। ভগবৎ-সম্বন্ধীয় এই ভয়-ভক্তি-ঐশ্বর্য্যমহিমার ভাব এই প্রেমের ভিতর একেবারে নিমজ্জিত করিয়া দিতে অনেক দিন লাগে।

মানুষের প্রেমের এই ঐশ্বরিক আদর্শকে আর একরূপে প্রকাশ করিয়াছে। উহার নাম মধুর ভাব উহাই সর্ব্বপ্রকার প্রেমের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ। জগতের সর্ব্বোচ্চ প্রেমের উপর উহার ভিত্তি—আর মানবীয় প্রেমের মধ্যে উহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবলতম। স্ত্রী-পুরুষের প্রেমে যেরূপ মানুষের সমুদয় প্রকৃতিটকে ওলট/পালট করিয়া ফেলে, আর কোন্ প্রেম সেরূপ করিতে পারে? কোন্ প্রেম লোকের প্রতি পরমাণুর মধ্য দিয়া সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে পাগল করিয়া তুলে—নিজের প্রকৃতি ভুলাইয়া দেয়—মানুষকে হয় দেবতা নয় পশু করিয়া দেয়? এই মধুর প্রেমে ভগবানকে আমাদের পতিরূপে চিন্তা করা হয়। আমরা সকলে স্ত্রী। জগতে আর পুরুষ নাই। কেবল একমাত্র পুরুষ আছেন—তিনিই, আমাদের সেই প্রেমাস্পদই একমাত্র পুরুষ। পুরুষ স্ত্রীকে এবং স্ত্রী পুরুষকে যে ভালবাসা দিয়া ভালবাসিয়া থাকে, সেই ভালবাসা ভগবান্‌কে অর্পণ করিতে হইবে। আমরা জগতে যত প্রকার প্রেম দেখিতে পাই, যাহা লইয়া আমরা অল্পাধিক পরিমাণে খেলা করিতেছি মাত্র, ভগবান্‌ই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য। তবে দুঃখের বিষয়, যে অনন্ত সমুদ্রে মহান্ প্রেমের নদী সদা প্রবাহিত হইতেছে, মানব তাহাকে জানে না, সুতরাং নির্ব্বোধের ন্যায় সে মানুষরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুতুলের প্রতি উহা প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করে। মানুষপ্রকৃতিতে সন্তানের

প্রতি যে প্রবল স্নেহ দেখা যায়, তাহা কেবল একটি সন্তানরূপ ক্ষুদ্র পুতুলের জন্য নহে; যদি তুমি অন্ধভাবে একমাত্র সন্তানের উপর উহাকে প্রয়োগ কর, তুমি তজ্জন্য বিশেষ ভোগ করিবে। কিন্তু ঐ ভোগ হইতেই তোমার এই বোধ আসিবে যে, তোমার ভিতরে যে প্রেম আছে, তাহা যদি কোন মনুষ্যে প্রয়োগ কর তবে শীঘ্রই হউক, বিলম্বেই হউক, অশান্তি আনয়ন করিবে। সুতরাং আমাদের প্রেম সেই পুরুষোত্তমের উপর প্রয়োগ করিতে হইবে—যাঁহার বিনাশ নাই, যাঁহার কখন কোন পরিবর্ত্তন নাই, যাঁহার প্রেমসমুদ্রে জোয়ারভাঁটা নাই। প্রেম যেন তাহার প্রকৃত লক্ষ্যে পঁহুছে, যেন উহা তাঁহার নিকটে পঁহুছে, যিনি প্রকৃতপক্ষে প্রেমের অনন্ত সমুদ্র-স্বরূপ। সকল নদীই সমুদ্রে পঁহুছে। একটি জলবিন্দু পর্য্যন্ত পর্ব্বতগাত্র হইতে পতিত হইয়া কেবল একটি নদীতে (উহা যত বড়ই হউক না কেন) থামিতে পারে না। অবশেষে সেই জলবিন্দু কোন না কোনরূপে সমুদ্রে প্রবেশ করে। ভগবান্ আমাদের সর্ব্বপ্রকার ভাবের একমাত্র লক্ষ্য। যদি রাগিতে চাও, ভগবানের প্রতি রাগ কর। তোমার প্রেমাস্পদকে ধমকাও—তোমার সখাকে ধমকাও। আর কাহাকে তুমি নির্ভয়ে তিরস্কার করিতে পার? মর্ত্ত্য-জীব তোমার রাগ সহ্য করিবে না। তাহাতে তোমার উপর প্রতিক্রিয়া আসিবে। যদি তুমি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হও, আমি অবশ্যই তোমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিব, কারণ আমি তোমার রাগ সহ্য করিতে পারিব না। তোমার প্রেমাস্পদকে বল, তুমি আমার কাছে কেন আসিতেছ না? কেন আমাকে একা ফেলিয়া রহিয়াছ? তাহা ছাড়া আর কিসে আনন্দ

আছে? ছোট ছোট মাটির ঢিপিতে আর কি সুখ আছে? অনন্ত আনন্দের জমাট সারকেই আমাদিগকে অন্বেষণ করিতে হইবে—ভগবান্‌ই এই আনন্দের জমাটবাঁধা। আমাদের প্রবৃত্তি ভাবাদি সবই যেন তাঁহার সমীপে যায়। উহারা তাঁহারই জন্য অভিপ্রেত। উহারা যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, তবে উহারা কুৎসিত রূপ ধারণ করিবে। যখন তাহারা ঠিক তাহাদের লক্ষ্যস্থলে অর্থাৎ ঈশ্বরের নিকট পঁহুছায়, তখন অতি নিম্নতম বৃত্তি পর্য্যন্ত অন্যরূপ ধারণ করে। মানুষের মন ও শরীরের সমুদয় শক্তি, তাহারা যে ভাবেই প্রকাশিত থাকুক না কেন, ভগবান্‌ই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য—একায়ন। মনুষ্যহৃদয়ের সব ভালবাসা—সব প্রবৃত্তি যেন ভগবানের দিকে যায়। তিনিই একমাত্র প্রেমের পাত্র। এই মনুষ্যহৃদয় আর কাহাকে ভালবাসিবে? তিনি পরম সুন্দর, পরম মহৎ, সৌন্দর্য্য-স্বরূপ, মহত্ত্বরূপ। তাঁহা অপেক্ষা জগতে আর সুন্দর কে আছে? তিনি ব্যতীত জগতে আর স্বামী হইবার উপযুক্ত কে? জগতে ভালবাসার উপযুক্ত পাত্র আর কে আছে? অতএব তিনিই যেন আমাদের স্বামী হন, তিনিই যেন আমাদের প্রেমাস্পদ হন। অনেক সময়ে এরূপ ঘটে যে, ভগবদ্ভক্তগণ এই ভগবৎপ্রেমের বিষয় বলিতে গিয়া সর্ব্বপ্রকার মানবীয় প্রেমের ভাষা উহাকে বর্ণনা করিবার উপযোগী বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। মূর্খেরা ইহা বুঝে না—তাহারা কখনও ইহা বুঝিবে না। তাহারা উহা কেবল জড়দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে। তাহারা এই আধ্যাত্মিক প্রেমোন্মত্ততা বুঝিতে পারে না। কেমন করিয়া বুঝিবে? "হে প্রিয়তম, তোমার অধরের একটি-মাত্র চুম্বন! যাহাকে তুমি একবার চুম্বন করিয়াছ, তোমার জন্য তাহার

পিপাসা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তাহার সকল দুঃখ চলিয়া যায়। সে তোমা ব্যতীত আর সব ভুলিয়া যায়। প্রিয়তমের সেই চুম্বন—তাঁহার অধরের সহিত সেই সংস্পর্শের জন্য ব্যাকুল হও—যাহাতে ভক্তকে পাগল করিয়া দেয়, যাহা মনুষ্যকে দেবতা করিয়া তুলে। ভগবান্ যাঁহাকে একবার তাঁহার অধরামৃত দিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন, তাঁহার সমুদয় প্রকৃতিই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। তাঁহার পক্ষে জগৎ উড়িয়া যায়—তাঁহার পক্ষে সূর্য্য-চন্দ্রের আর অস্তিত্ব থাকে না—আর সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চই সেই এক অনন্ত প্রেমের সমুদ্রে মিলাইয়া যায়। ইহাই প্রেমোন্মত্ততার চরমাবস্থা, প্রকৃত ভগবৎ-প্রেমিক আবার ইহাতেও সন্তুষ্ট নহেন। স্বামি-স্ত্রীর প্রেমও তাঁহার নিকট তত উন্মাদকর নহে। ভক্তেরা অবৈধ (পরকীয়া) প্রেমের ভাব গ্রহণ করিয়া থাকেন, কারণ উহা অতিশয় প্রবল। উহার অবৈধতা তাঁহাদের লক্ষ্য নহে। এই প্রেমের প্রকৃতি এই যে, যতই উহা বাধা পায় ততই উহা উগ্রভাব ধারণ করে। স্বামি-স্ত্রীর ভালবাসা অবাধ—উহাতে কোন বাধাবিঘ্ন নাই। সেই জন্য ভক্তেরা কল্পনা করেন, যেন কোন বালিকা তাঁহার প্রিয়তম পুরুষে আসক্ত আর তাঁহার পিতা, মাতা বা স্বামী ঐ প্রেমের বিরোধী। যতই ঐ প্রেম বাধাপ্রাপ্ত হয়, ততই উহা প্রবল ভাব ধারণ করিতে থাকে। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে কিরূপে লীলা করিতেন, কিরূপে সকলে তাঁহাকে উন্মত্ত হইয়া ভালবাসিত, কিরূপে তাঁহার সাড়া

* সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠুচুম্বিতম্।
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্ ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ, ৩১শ অধ্যায়, ১৪ শ্লোক

পাইবামাত্র গোপীরা—সেই ভাগ্যবতী গোপীরা সমুদয় ভুলিয়া, জগৎ ভুলিয়া, জগতের সকল বন্ধন, জাগতিক কর্তব্য—ইহার সমুদয় সুখদুঃখ ভুলিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত, মানবীয় ভাষা তাহা প্রকাশ করিতে অক্ষম। মানুষ—মানুষ, তুমি ঐশ্বরিক প্রেমের কথা কও, আবার জগতের সব ভ্রমাত্মক বিষয়ে নিযুক্ত থাকিতেও পার। তোমার কি মনমুখ এক? "যেখানে রাম আছেন সেখানে কাম থাকিতে পারে না। যেখানে কাম, সেখানে রাম থাকিতে পারেন না";* উহারা কখন একত্রে থাকে না। আলো-আঁধার কখন এক সঙ্গে থাকে না।

* জহাঁ রাম তহাঁ কাম নহী, জহাঁ কাম তহাঁ নহী রাম।
—তুলসীদাসজীকৃত দোঁহা

উপসংহার

যখন প্রেমের এই উচ্চতম আদর্শে উপনীত হওয়া যায়, তখন জ্ঞান কোথায় চলিয়া যায় কে আর তখন জ্ঞানের জন্য ব্যস্ত হইবে? মুক্তি, উদ্ধরণ, নির্ব্বাণ—এ সবই তখন কোথায় চলিয়া যায়। এই ঈশ্বর-প্রেম সম্ভোগ করিতে পাইলে কে মুক্ত হইতে চাহে? "ভগবন্, আমি ধন জন সৌন্দর্য্য বিদ্যা—এমন কি মুক্তি পর্য্যন্ত চাহি না। জন্মে জন্মে তোমাতে যেন আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে।" ভক্ত বলেন, "চিনি হওয়া ভাল নয়, চিনি খেতে ভালবাসি।" তখন কে মুক্ত হইবার ইচ্ছা করিবে? কে ভগবানের সহিত অভেদভাব আকাঙ্ক্ষা করিবে? ভক্ত বলেন, "আমি জানি তিনি ও আমি এক, কিন্তু তথাপি আমি তাঁহা হইতে আমাকে পৃথক্ রাখিয়া প্রিয়তমকে সম্ভোগ করিব।" প্রেমের জন্য প্রেম—ইহাই তাঁহার সর্ব্বোচ্চ সুখ। প্রিয়তমকে সম্ভোগ করিবার জন্য কে না সহস্রবার বদ্ধ হইবে? কোন ভক্তই প্রেম ব্যতীত অন্য কোন বস্তু কামনা করেন না। তিনি স্বয়ং ভালবাসিতে চান আর চান ভগবান্ যেন তাঁহাকে ভালবাসেন। তাঁহার নিষ্কাম প্রেম যেন উজান বাহিয়া যাওয়া। প্রেমিক যেন নদীর উৎপত্তিস্থানের দিকে, স্রোতের বিপরীত দিকে যান। জগৎ তাঁহাকে পাগল বলে। আমি জানি কোন ব্যক্তিকে লোকে পাগল বলিত। তিনি উত্তর দিতেন, "বন্ধুগণ, সমুদয় জগৎ একটি বাতুলালয়। কেহ সাংসারিক প্রেম লইয়া উন্মত্ত। কেহ নামের জন্য, কেহ যশের জন্য, কেহ অর্থের

জন্য, আবার কেহ বা মুক্তি বা স্বর্গের জন্য উন্মত্ত। এই বিরাট বাতুলালয়ে আমিও পাগল। আমি ভগবানের জন্য পাগল। তুমি টাকার জন্য পাগল। আমি ঈশ্বরের জন্য পাগল। তুমিও পাগল, আমিও তাহাই। আমার বোধ হয়, আমার পাগলামিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।" প্রকৃত ভক্তের প্রেম এইরূপ তীব্র উন্মত্ততা আর উহার সম্মুখে আর সবই উড়িয়া যায়। সমুদয় জগৎ তাঁহার নিকট প্রেম, কেবল প্রেমপূর্ণ—প্রেমিকের চক্ষে এইরূপই প্রতীয়মান হয়। যখন মানুষের ভিতর এই প্রেম প্রবেশ করে, তখন তিনি অনন্ত কালের জন্য সুখী, অনন্তকালের জন্য মুক্ত হইয়া যান। ভগবৎ-প্রেমের এই পবিত্র উন্মত্ততাই কেবল আমাদের অন্তরস্থ সংসার-ব্যাধি অনন্তকালের জন্য আরোগ্য করিতে পারে।

প্রেমের ধর্ম্মে আমাদিগকে দ্বৈতভাবে আরম্ভ করিতে হয়। ভগবান্ আমাদের পক্ষে আমাদের হইতে ভিন্ন, আর আমরাও তাঁহা হইতে আমাদিগকে ভিন্ন বোধ করি। প্রেম উহাদের মধ্যে আসিয়া উভয়ের মিলন সম্পাদন করে। তখন মানুষ ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে আর ভগবান্ও মানুষের ক্রমশঃ অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইতে থাকেন। মানুষ সংসারে সব সম্বন্ধ— যেমন পিতা, মাতা, পুত্র, সখা, প্রভু, প্রণয়ী প্রভৃতি ভাব লইয়া তাঁহার প্রেমের আদর্শ ভগবানের প্রতি আরোপ করিতে থাকেন। তাঁহার নিকট ভগবান্ এই সর্ব্বপ্রকাররূপে বিরাজিত। আর তিনি তখনই উন্নতির চরম সীমায় উপস্থিত হন, যখন তিনি নিজ উপাস্যদেবতাতে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন হইয়া যান। আমরা প্রথমাবস্থায় সকলেই নিজেদের ভালবাসি। এই ক্ষুদ্র অহং-এর অসঙ্গত

দাবি প্রেমকেও স্বার্থপর করিয়া তুলে। অবশেষে কিন্তু পূর্ণ জ্ঞানজ্যোতির বিকাশ হয়, আর এই ক্ষুদ্র 'অহং' সেই অনন্তের সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছে, দেখা যায়। মানুষ স্বয়ং এই প্রেমজ্যোতির সম্মুখে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া যান। তাঁহার পূর্বে অল্পাধিক পরিমাণে যে-সকল ময়লা ও বাসনা ছিল, তখন তাহা সব চলিয়া যায়। তিনি অবশেষে এই সুন্দর প্রাণমাতানো সত্য অনুভব করেন যে, প্রেম প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ একই।